আলাহ্ওয়ালা

[পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দা ও কামেল মুমিনের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং ঈমান ও আকীদার বিস্তারিত আলোচনা। যা জান্নাত প্রত্যাশী প্রতিটি মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।]

মূল

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)

মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান

সংকলন ও অনুবাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

দাওরা ও ইফ্‌তা : জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস : জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব : রাজারদেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা



মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আল্লাহ্ওয়ালা

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)

সংকলকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم

পাকিস্তানের একটি মশহুর পত্রিকা– 'মাসিক সাইয়্যারাহ ডাইজেষ্ট'। যার বৈশিষ্ট হলো, ইসলামী মৌলিক বিষয়াবলীর উপর সুবৃহত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা। এই পত্রিকার প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাসমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআন বিশেষ সংখ্যাটি তিন খণ্ডে ১৩৮৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত এবং এই সংখ্যাটি সমগ্র উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এই সংখ্যায় জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এর 'কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহনের পন্থা' শীর্ষক একটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। সেই রচনায় বিখ্যাত তাবেয়ী ও আরবের অন্যতম সরদার হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন কোন এ ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলো ঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (سورة الانبياء- ١٠)

অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদেরই আলোচনা রয়েছে। তোমরা কি বুঝতে পারো না।

(সূরা আম্বীয়া ১০ আয়াত)

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) এ আয়াত শুনে চমকে উঠলেন। মনে মনে বললেন, কুরআনে আমাদের আলোচনা আছে? তাহলে কুরআন শরীফ দেখা দরকার। তিনি কুরআন নিয়ে বসে গেলেন। একের পর এক লোকদের অবস্থা তিনি পবিত্র কুরআনের ভাষায় প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

কোথায় তিনি দেখতে পেলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব নবী-রাসূল (সাঃ), সাহাবী ও বুযুর্গদের আলোচনা। আবার কোথায় দেখতে পেলেন দুনিয়ার

সর্ব নিকৃষ্ট কাফের মুশরিক ও ফাসেকদের আলোচনা। মোট কথা সর্ব শ্রেণীর লোকের আলোচনাই তিনি পবিত্র কুরআনে দেখতে পেলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি পবিত্র কুরআনের ভাষায় নিজেকেও আবিষ্কার করলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - (سورة التوبة ١٠٢)

অর্থাৎ, আর কতিপয় লোক (এমন) আছে যারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ এবং অন্য একটি বদকাজ। হয়তো অচীরেই আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুনাময়। (তাওবাহ ১০২ আয়াত)

এই আয়াত পাঠ করে হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) বলে উঠলেন, বাস! ব্যস! আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।

হযরত আলী মিয়া নদভী (রহঃ) এর এই রচনা পড়ার পর থেকে আমার ভেতরে এক অন্য রকম অনুভূতি কাজ করতে শুরু করে।

বেশ কিছু দিন পূর্বে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) এর জগদ্বিখ্যাত তাফসীর "মা'আরেফুল কুরআনের" ষষ্ঠ খণ্ডে সূরা ফুরকানের শেষ রুকুতে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর আলোচনা ও তার চমৎকার তাফসীর পাঠ করার সৌভাগ্য হয়। সে সময় টিকায় এই কথাটি লেখা দেখতে পাই যে, কেউ যদি এ অংশটিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করেন, তাহলে শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, লিখে দিবেন'। তখনই এটাকে পৃথকভাবে প্রকাশ করার চাহিদা অনুভূত হয়। পরবর্তিতে সূরা মুমেনুনের তাফসীর পাঠকালে সেখানেও কামেল মুমিনের গুণাবলীর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পাঠ করে দু'টিকে একত্রে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেই। এরও পরে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) এর খলীফাগণের মধ্য হতে হাজী আব্দুল গফুর জৌধপুরী (রহঃ) এর বিস্ময়কর আত্মকাহিনী পাঠ করে এটাকেও এ বইয়ে যুক্ত করার আগ্রহ হলো। দু একজনের সাথে পরামর্শ করলে সকলেই ভাল হবে বলে মত দিলেন।

আমার ইচ্ছে ছিলো প্রতিটি গুণের সাথে সেই গুণে গুণান্বিত সাহাবায়ে কেরামের কাহিনী যুক্ত করার, কিন্তু সময়ের সল্পতাহেতু তা সম্ভব হলো না। পরবর্তিতে এ কাজ করার ইরাদা আছে ইনশাআল্লাহ্।

এই সংকলনের তিনটি অংশ। প্রথম অংশে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে কামেল মুমেনের গুণাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঈমান-আকীদার জরুরী বিষয়গুলো যা তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের এ অংশে বর্ণিত হয়নি। আমরা সেগুলোকে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) এর কিতাব থেকে চয়ন করে এ অংশে যুক্ত করেছি, যাতে সহজেই ঈমান-আকীদার জরুরী কথা সকলে জেনে নিজেদের ঈমানকে মজবুত করতে পারে। তৃতীয় অংশে একজন আল্লাহওয়ালার বিস্ময়কর আত্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো একথার বাস্তব উদাহরণ পেশ করা যে, সহীহ নিয়তে একটু সাধনার মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়ার দিক থেকে নিঃস্ব একজন মানুষ কিভাবে ইহ ও পারলৌকিক ঐশর্য্যের চরম শিখরে আরোহন করতে পারে।

আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী মাসিক মদীনা সম্পাদক জনাব মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের কাছে চীর কৃতজ্ঞ, কারণ তার সম্পাদিত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ থেকে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি। স্বনাম ধন্য লেখক, গবেষক ও তরুণ আলিম বন্ধুবর মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদেরও শোকরিয়া আদায় করছি, কারণ 'আল্লাহ্ওয়ালা' নামটি তারই প্রস্তাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভে আগ্রহী প্রতিটি ব্যক্তিই এই বই পাঠ করে উপকৃত হবেন।

যারা আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর, এই বই তাদেরকে আরো অগ্রসর হতে উৎসাহ জোগাবে।

যারা আল্লাহ্‌র পথ ভুলে গোমরাহী ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে, এই বই তাদেরকে সঠিক-সরল পথ সিরাতে মুস্তাকীমে ফিরে আসতে আগ্রহী করবে।

দুনিয়ার মোহে পড়ে যারা আখিরাত ধ্বংস করছে, এই বই তাদের দৃষ্টিকে খুলে দিবে। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে সফলকাম একটি মানবগোষ্ঠি গড়ে তুলতে এই বই ভূমিকা রাখবে। ইনশা আল্লাহ্।

বইটি ক্রটি মুক্ত করতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তারপরও কিছু ভুল-ক্রটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বইটিকে সুন্দর ও ক্রটি মুক্ত করতে সকলের সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআনের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় আমল করে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনয়াবনত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান

জামি'আ ইসলামিয়া ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৬ই রবিউল আউয়াল

১৪২১ হিজরী

সূচীপত্র

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(سورة الذريات ٥٦)

অর্থাৎ, আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

(সূরা আয-যারিয়াত ৫৬ আয়াত)

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

পবিত্র কুরআনে সূরা ফুরকানের শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাওহীদ ও রিসালাতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার অনুসারী ও শরী'অতের নির্দেশাবলীর অনুগত।

কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে "ইবাদুর রহমান" –রহমানের বান্দা উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সম্মান। সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্ট-জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্র দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু বলতে পারে না করতে পারেনা ; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা-বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্র ইচ্ছারও হুকুমের অনুগামী করে দেয়া। এধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ্ থেকে তাওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্যে আল্লাহ্তা'আলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলীর মধ্য হতে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ্তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত। নিম্নোক্ত

আয়াতসমূহে আল্লাহ্পাকের বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত আমল ও কর্মে আল্লাহ্ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে সাথে আল্লাহ্ভীতি, যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

প্রথম গুণ

আল্লাহ্‌র দাসত্ব

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا -

আয়াতের তরজমা

রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন তাদের সাথে নির্বোধ লোকেরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, 'রহমান'-এর (দয়াল আল্লাহ্‌র) বিশেষ বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে, উদ্দেশ্য এই যে, তাদের স্বভাবে সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য

নয়। কেননা, অহংকার সহ নম্রভাবে চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয়-নম্রতা তাদের নিজেদের কাজে,কর্মে এবং অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে, যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞতার কথা-বার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। অর্থাৎ, কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরী'অতের শাসন এবং আল্লাহ্‌র কালিমা সমুন্নত রাখার জন্য করা হয়।

বান্দার পরিচয়

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার সর্বপ্রথম গুণ عباد (ইবাদ) হওয়া। عباد শব্দটি عبد এর বহুবচন। عبد অর্থ, বান্দা, দাস ; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং যার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্তা'আলার বান্দা বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য সে ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, সকল ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্খা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও কর্মকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

দ্বিতীয় গুণ

নম্রভাবে চলাফেরা করা

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে।

নম্রভাবে চলাফেরার মাপকাঠি

هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয়। অর্থাৎ, গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়।

কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাত বিরোধী। শামায়েলের হাদীছ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ধীরে চলতেন না ; বরং কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতেন। হাদীছের ভাষা এরূপ, كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تَطْوِى لَهُ –অর্থাৎ, চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্যে কুঞ্চিত হত। (ইবনে কাছীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্তিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ্ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ ? সে বলল, না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। (ইবনে কাছীর)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا আয়াতের তাফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে ; অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের ওপর আল্লাহ্ভীতি প্রবল, যা অন্যদের ওপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশ গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্র নে'আমত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরী রয়েছে। (ইবনে কাছীর)

এছাড়া সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا - إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا -

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে গর্বভরে বিচরণ করো না। (কেননা) তুমি (ভূ-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদভরে) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং (দেহকে উঁচু করে) পাহাড়ের উচ্চতায় পৌছতে পারবে না।

ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে চলা, অহংকার

অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধ সুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায়। এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহ্র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃত পক্ষে মানুষের অন্তরের একটি রোগ যা কবীরাহ্ গোনাহ্। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ, অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীছ শরীফে এর জন্যে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে, এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে। (মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম) হযরত আবু

হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ বড়ত্ব আমার চাদর, এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি, যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে চাদর ও লুঙ্গি বলে আল্লাহ্র বড় ও মহত্বগুণ বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুণে আল্লাহ্র শরীক হতে চায়, সে জাহান্নামী।

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা অহংকার করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপিলিকার সমান মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, এবং তাদেরকে পান করার জন্যে জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পূঁজ, রক্ত ইত্যাদি দেয়া হবে। (তিরমীযী)

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) একবার এক ভাষণে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট, কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন, ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শুকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়। (মাযহারী)

তৃতীয় গুণ

অজ্ঞলোকদের সাথে নিরাপত্তার কথা বলা

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

আয়াতের তরজমা

অর্থাৎ, যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম।

অজ্ঞাতস্পন্ন লোকদের সাথে বাক্যালাপের নিয়ম

এখানে جاهلون শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয় ; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। সালাম শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি ; বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাস থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে سلام শব্দটি تسليم থেকে নয় ; বরং تسلم থেকে নির্গত ; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যেরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ ও হযরত মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। (মাযহারী)

চতুর্থ গুণ

আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি যাপন

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا -

আয়াতের তরজমা

অর্থাৎ, এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে। সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র সাথে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে, রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদারত ও দন্ডায়মান অর্থাৎ, নামাযে রত থাকে।

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও ইবাদতের জন্যে দন্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোকদেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে তালীম (শিক্ষাদান) তাবলীগ (প্রচার) জিহাদ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহ্র সামনে ইবাদত করে। হাদীছে তাহাজ্জুদ নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফ্ফারা এবং গোনাহ থেকে নিবৃত্তকারী।

(মাযহারী)

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী। بَاتَ لِلّٰهِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا (অর্থাৎ, সে আল্লাহ্র জন্য সিজদারত ও দন্তায়মান অবস্থায় রাত্রি যাপন করলো) বলে গন্য হবে। (মাযহারী, বগভী) হযরত উসমান গনী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। (আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম গুণ

দোযখ থেকে পানাহ্ চাওয়া

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ - اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا -

আয়াতের তরজমা

অর্থাৎ, এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাব হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর আযাব নিশ্চিত বিনাশ। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।

আল্লাহ্কে ভয় করে দু'আ করা

অর্থাৎ, দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা যে, আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহ্কে ভয় করত দু'আ করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আযাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। আল্লাহপাকের এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ; বরং সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যতঃ চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্র কাছে দু'আও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ

অপব্যয় ও কৃপণতা না করা

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا -

আয়াতের তরজমা

অর্থাৎ, এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না কৃপণতাও করেনা এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তি।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, আর্থিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে, তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না। গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। জরুরী সৎকর্মে ব্যয় করতে ত্রুটি করে না। বিনা প্রয়োজনে সামর্থের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অযথা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় গোনাহ্। যে বস্তু গোনাহ্‌র কারণ হয় তাও গোনাহ্। কাজেই পরিণামে তাও গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়ে যায়। এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা لَمْ يَقْتُرُوْا থেকে জানা গেল। কারণ, কম ব্যয় করা যখন জায়েয নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে ব্যয়ে ত্রুটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে ; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। মোটকথা, তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি থেকে পবিত্র এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের অর্থাৎ, ত্রুটি ও বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তী হয়ে থাকে।

কৃপণতা ও অপব্যয়ের সীমা রেখা

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটি করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اسراف এবং এর বিপরীতে اقتار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اسراف এর অর্থ, সীমা অতিক্রম করা। শরী'অতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اسراف। তথা অপব্যয় ; যদি তা এক পয়সাও হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ্ (রহঃ) ও ইবনে জুরায়জ প্রমুখের এটাই মত। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تبذير তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ্। আল্লাহ্ বলেন اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ (অর্থাৎ, নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই) এ দিক দিয়ে এই তাফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায় ; অর্থাৎ, গোনাহ্‌র কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়। (মাযহারী)

اقتار শব্দের অর্থ, ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরী'অতের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্‌পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই তাফসীরও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), কাতাদাহ্ (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। (মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সমতা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهٗ فِيْ مَعِيْشَتِهٖ অর্থাৎ, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

(আহমদ, ইবনে কাছীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা ও সমতার ওপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না। (আহমদ, ইবনে কাছীর)

সপ্তম গুণ

ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

আয়াতের তরজমা

এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা গোনাহ্ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না। কারণ এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত (মারাত্মক) গোনাহ্।

শিরক সবচেয়ে বড় গোনাহ্

পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখন গোনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না। এ থেকে জানা গেলো যে, শিরক সবচেয়ে বড় গোনাহ্।

অষ্টম ও নবম গুণ

অন্যায়ভাবে হত্যা না করা এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী না হওয়া

وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا - يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا -

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا -

আয়াতের তরজমা

এবং আল্লাহ্ যার হত্যাকে হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করেনা। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহ্‌কে ছওয়াব দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয়ই সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার হত্যা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না। তবে যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের কোন শরী'অতসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা। এবং তারা ব্যভিচার করে না। এই হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত মারাত্মক গোনাহ্। যারা এ কাজ করে, অর্থাৎ, শিরক করে অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যভিচারও করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা করত, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে। যেমন, অন্য আয়াতে আছে زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (অর্থাৎ, তাদের আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দিবো) এবং তারা তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে, যাতে দৈহিক শাস্তির সাথে সাথে লাঞ্ছনার আত্মিক শাস্তিও হয় এবং শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমাণ ও বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ, চিরকাল বসবাস

করাও হয়। وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ বলে কাফের ও মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত يضاعف - يخلد - مهانا - وَاٰمن ইত্যাদি বাক্যে রয়েছে। কেননা, পাপী মুমিনের শাস্তি বর্ধিত ও চিরস্থায়ী হবে না ; বরং তাকে পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে, লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর জন্য ঈমানের নবায়ন জরুরী নয়, শুধু তাওবা করা যথেষ্ট। পরবর্তী وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ আয়াতে একথা বর্ণিত রয়েছে। উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে শানেনুযূলও এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু যারা শিরক ও গোনাহ্ থেকে তাওবা করে, শর্ত এই যে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে অর্থাৎ ঈমান আনয়নের সাথে সাথে জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা, জাহান্নাম তাদেরকে বিন্দুমাত্র স্পর্শও করবে না ; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অতীত গোনাহকে ভবিষ্যত ছওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। কারণ যেহেতু অতীত কুফর ও গোনাহ্ ইসলামের বরকতে মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সৎকর্মের কারণে ছওয়াব লিখিত হতে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এবং এই গোনাহ মাফ ও ছওয়াব লিখন এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, তাই গোনাহ মাফ করে দেন এবং পরম দয়ালু তাই ছওয়াব দান করেন। এ ছিল কুফর থেকে তাওবাকারীর বর্ণনা। অতঃপর গোনাহ্ থেকে তাওবাকারী মুমিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তাওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু কোন সময় গোনাহ হয়ে গেলে তাওবা করে নেয়। তাই তাওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, সেও আযাব থেকে

বেঁচে থাকবে। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে অর্থাৎ, ভয় ও আন্তরিকতা সহকারে, কারণ তাওবা কবুলের জন্য ভয় ও আন্তরিকতা শর্ত।

কতিপয় মারাত্মক আমলী গোনাহ্

لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে আমলী গোনাহসমূহের মধ্য হতে কতিপয় প্রধান ও মারাত্মক গোনাহ্ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহ্র কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ্ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উল্লেখিত গোনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা (রাযিঃ) اثام শব্দের তাফসীর করেছেন গোনাহ্র শাস্তি। কেউ কেউ বলেন اثام জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীছও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। (মাযহারী)

কাফের ও মুমিনের শাস্তির পার্থক্য

অতঃপর উল্লেখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমতো يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ (অর্থাৎ, তার শাস্তি দ্বিগুণ হবে) কথাটি মুসলমান গোনাহ্গারদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্যে একটি শাস্তির কথাই কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ : এই শাস্তি

সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে ; অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোন মুমিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, সাথে সাথে, কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে।

তাওবার দ্বারা গোনাহ ছওয়াবে পরিবর্তিত হবে

অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তাওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তাওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে সব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গোনাহ্ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), হাসান বসরী (রহঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। (মাযহারী)

ইবনে কাছীর এর আরও একটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফেররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোন সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তাওবা করবে। তাদের এই

কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাছীর এই তাফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীছও উল্লেখ করেছেন।

মুমিন ও কাফেরের তাওবার ভিন্নতা

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (অর্থাৎ, যে তাওবা করে ও নেক আমল করে নিশ্চয় সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে।) বাহ্যতঃ এটা পূর্বোক্ত إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا (অর্থাৎ, কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে।) বাক্যে বিবৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তাওবা পূর্বোক্ত তাওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফের ও মুশরিকদের তাওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তাওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তাওবার সাথে وامن (অর্থাৎ, বিশ্বাস স্থাপনের কথা) বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তাওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তাওবা যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল ; কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তাওবা করার পর যদি মৌখিক তাওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তাওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তাওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يتوب উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তাওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তাওবা উল্লেখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তাওবা করে, অতঃপর সৎকর্ম দ্বারাও তাওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ্ থেকে তাওবা তো করে ; কিন্তু ভবিষ্যত

ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তাওবা যেন তাওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অসাবধানতাবশতঃ পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তাওবা করে এবং তাওবার পর কর্মও এমন করে, যাদ্বারা তাওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তাওবাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ্র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তাওবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুণরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ

মিথ্যা কাজে যোগদান না করা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

আয়াতের তরজমা

এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের এই গুণ যে, তারা অনর্থক কাজে (যেমন, খেলা-ধুলা ও শরী'অত বিরোধী কাজে) যোগদান করে না।

মিথ্যা ও বাতিল মজলিস

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিলতো শিরক ও কুফর। এরূপর

সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রহঃ) বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহ্রী (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর)

আসল কথা এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা, ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখাও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত। (মাযহারী)

মিথ্যা সাক্ষ্য সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ্

কোন কোন তাফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُونَ শব্দটিকে شهادة অর্থাৎ, সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ্ তা কুরআন ও হাদীছে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত উমর ফারূক (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। (মাযহারী)

একাদশ গুণ

অসার ক্রিয়া-কর্মের সম্মুখিন হলে ভদ্রভাবে চলে যাওয়া

আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا -

আয়াতের তরজমা

এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে চলে যায়।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যদি ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায় অনর্থক ক্রিয়া-কর্মের নিকট দিয়ে যায়, তবে গম্ভীর ও ভদ্র হয়ে চলে যায়। অর্থাৎ, তাতে মশগুল হয় না এবং কার্য কলাপ দ্বারা গোনাহ্‌গারদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না।

ভদ্র ব্যক্তি ও পাপের মজলিস

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا –অর্থাৎ, যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোন দিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ, মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাযিঃ) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে

গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ কারীম (অর্থাৎ, ভদ্র) হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছে দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে। (ইবনে কাছীর)

দ্বাদশ গুণ

আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ না করা।

আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

আয়াতের তরজমা

এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'আলার বিধানাবলী দ্বারা উপদেশদান করা হলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে তার বিধানাবলীর উপর পতিত হয় না। কাফেররা যেমন কুরআনকে অভিনব বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এর স্বরূপ ও তত্ত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভীড় জমাতো। অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

(আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দা যখন তাঁর ইবাদাতের জন্য দন্ডায়মান হয়, তখন কাফের সম্প্রদায় তার পাশে ভীড় জমায়)।

উল্লেখিত বান্দাগণ এরূপ করে না ; বরং বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কুরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কুরআনের প্রতি আগ্রহভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফেরদের কুরআনে পতিত হওয়াতো প্রমাণিত হয়, কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধ বধিরের পতিত হওয়ার অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিন্দনীয়।

আয়াতের উপর আমলের নিয়ম

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

অর্থাৎ, এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্‌র আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবনশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অমনোযোগী ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। এক, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ওপর পতিত হওয়া অর্থাৎ, গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট ছওয়াবের কাজ। দুই, অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া ; অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় ; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে ; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের ওপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাছীর (রহঃ) ইবনে আওন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সেজদারত আছে, এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সেজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাব ? হযরত শা'বী (রহঃ) বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মুমিনের জন্যে বৈধ নয় ; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরী। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

কুরআন অধ্যয়নের নিয়ম

এ যুগে যুব সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারও তাফসীর দেখে কুরআনকে বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোন উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে

নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী উস্তাদের পথ প্রদর্শন ব্যতীত এই নীতি বিবর্জিত কুরআন পাঠও খোদায়ী আয়াতে অন্ধ-বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের পথিক হওয়ার তাওফীক দান করুন।

ত্রয়োদশ গুণ

সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য দু'আ করা

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا - أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا - خَالِدِينَ فِيهَا - حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا - قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا -

আয়াতের তরজমা

এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শ স্বরূপ করুন। তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দু'আ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম। বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, তারা নিজেরা যেমন দ্বীনের আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দ্বীনের আশেক বানাতে চেষ্টা করে থাকে। সেমতে কার্যতঃ চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও দু'আ

করে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের শীতলতা অর্থাৎ, শান্তি দান করুন। অর্থাৎ, তাদেরকে দ্বীনদার করুন, এবং আমাদেরকে এই চেষ্টায় সফল করুন, যাতে তাদেরকে দ্বীনদার দেখে শান্তি ও আনন্দলাভ করতে পারি। এবং আপনিতো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছেনই, কিন্তু আমাদের দু'আ এই যে, তাদের সবাইকে মুত্তাকী করে আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাতে দোষ নেই ; বরং আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজ পরিবারের মুত্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থাৎ, আমরা এখন শুধু পরিবারের নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুত্তাকী পরিবারের নেতা বানিয়ে দিন। এ পর্যন্ত রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে।

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতিদান

তাদেরকে জান্নাতে বসবাসের জন্যে উপরতলার কক্ষ দেওয়া হবে, কারণ তারা তাদের ধর্ম তথা ঈমান ও আমলের উপর দৃঢ়তর ছিলো এবং তারা সেখানে (অর্থাৎ, জান্নাতে) ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে স্থায়িত্বের দু'আ ও সালাম পাবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান ! যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (অর্থাৎ, আবাসস্থল এবং বাসস্থান হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট) হে নবী, আপনি সাধারণভাবে লোকদেরকে বলে দিন আমার পালনকর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, তোমরা ইবাদত না কর। অতএব এ থেকে বোঝা উচিত যে, হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরাতো আল্লাহ্র বিধানাবলীকে মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্বর এটা (মিথ্যা মনে করা) তোমাদের জন্যে অনিবার্য বিপদ হয়ে যাবে। তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফেরদের ওপর বিপদ এসেছে কিংবা পরকালে হোক, এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

চোখের শীতলতা কি ?

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا -

(অর্থাৎ, যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।)

এখানে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমার জন্যে চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার অর্থ হযরত হাসান বসরীর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত আছে ।

এখানে এই দু'আ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তারা তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন।

নেতৃত্ব কামনার অর্থ

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দু'আর এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا অর্থাৎ আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্টত্ব অর্জনের দু'আ আছে, যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ মনে হয়, যেমন এক আয়াতে আছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থাৎ, আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলেম এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকে। কাজেই এই দু'আর সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দু'আ করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে (রহঃ) মুত্তাকী করার দু'আ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী বলেন, এই দু'আয় নিজের জন্যে কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরাও এর ছওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী (রহঃ) বলেন, দু'আর উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যাদ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী (রহঃ) উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই ; অর্থাৎ, যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়—জায়েয। পক্ষান্তরে لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। والله اعلم -

এপর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ, কামেল মুমিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের জন্য বেহেশ্তের সুসংবাদ

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ – غرفة –শব্দের আভিধানিক অর্থ বালাখানা তথা ওপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবু মালেক আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কক্ষ কাদের জন্যে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। (মাযহারী)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا – অর্থাৎ, জান্নাতের অন্যান্য নে'আমতের সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মুমিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনরায় কাফের ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ –এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে সংক্ষিপ্ত তাফসীরে লেখা হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ –অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি, এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এর পর রিসালাত এবং ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই। فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا অর্থাৎ, এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

نعوذ بالله من حال اهل النار

কামেল মুমিন

পূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে (হিসাবের জন্য) দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং স্বীয় নফ্সকে খেয়াল-খুশি মতো চলা থেকে বিরত রেখেছে। নিশ্চয় জান্নাত হবে তার ঠিকানা।
(নাযি'আত ঃ ৪০-৪১)

অন্যতম মৌলিক গুণ
ঈমানদার হওয়া

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

তরজমা ঃ

মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ঃ

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে সব মুসলমান (পরকালে) সফলকাম হয়েছে যারা ঈমান তথা বিশ্বাস শুদ্ধ করণের সাথে সাথে নিম্নে বর্ণিত সাতটি গুনে গুনান্বিত হয়। কিন্তু ঈমান-ও আকীদা যেহেতু একটি বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় তাই এ সম্পর্কিত জরুরী কথাগুলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ঈমান ও আকীদার জরুরী কথা [১]

মুমিনের পরিচয়

মুমিন ঈমানদার ব্যক্তিকে বলা হয়। ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান এবং গায়ব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। শরী'অতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়,

---

টিকা ঃ মূল কিতাবে এখানে ঈমান আকীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের সুবিধার জন্য আমরা ঈমান-আকীদার আলোচনাকে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) রচীত "বেহেশতী যেওর" কিতাব থেকে চয়ন করে এখানে সন্নিবেশিত করেছি। (সংকলক)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া কোন সংবাদ কেবলমাত্র তাঁর উপর বিশ্বাস বশতঃ মেনে নেয়াকে।

গায়ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সব বস্তু যা বহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে গায়ব শব্দ দ্বারা ঐ সকল বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বীয় বুদ্ধি বলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলি এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং তা সংগঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশ্তাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের (আঃ) বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

(মা'আরেফুল কুরআন ১৩ পৃঃ)

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ্পাক প্রকৃত মুমিনের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। এ সকল আয়াতের মধ্য হতে কোন কোন আয়াতে মুমিনের জন্য দোযখ থেকে মুক্তি ও বেহেশ্তের ওয়াদা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারাকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কামিয়াবী বলা হয়েছে। ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়াবলী ভালমত জেনে নিয়ে ঈমান ও আমল দুরস্ত করতঃ পরকালের কামিয়াবীর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই প্রকৃত মুমিনের কাজ। আল্লাহ্পাক আমাদের সবাইকে খাঁটি মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আক্বীদা কি ও কেন ?

কোন বিষয় মনে-প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আক্বীদা বলে। শরী'অত যে বিষয়কে যেমন বর্ণনা করেছে তা ঠিক তেমনই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যাবে না, এরই নাম আক্বীদা।

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করে, সর্বদা নেক কাজ করে, তাকে মুমিন বলা হয়। মুমিনের জন্য আল্লাহ্পাক বেহেশ্তের সুসংবাদ দিয়েছেন। (সংকলক)

আল্লাহ্পাক সম্পর্কে আক্বীদা

১। আল্লাহ্তা'আলা ব্যতীত অন্য দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, প্রথমে তা কিছুই ছিলো না। আল্লাহ্তা'আলা পরে এ সকল সৃষ্টি করেছেন।

২। আল্লাহ এক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী বা মোহতাজ[১] নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর স্ত্রী নেই। তাঁর মোকাবেলা[২] কেউ নেই।

৩। তিনি অনাদি এবং অনন্ত, সকলের পূর্ব হতে আছেন, তাঁর শেষ নেই।

৪। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ হতে পারে না। তিনি সর্বাপেক্ষা বড় এবং সকল হতে পৃথক।

৫। তিনি জীবিত আছেন। সব বিষয়ের উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। সৃষ্টি জগতে তাঁর অবিদিত কিছুই নেই। তিনি সবকিছুই দেখেন, সবকিছুই শুনেন। তিনি কথা বলেন ; কিন্তু তাঁর কথা আমাদের কথার মত নয়। তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন, কেউ তাতে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না।

৬। একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। অর্থাৎ, অন্য কারও বন্দেগী করা যায় না। তাঁর কোনই শরীক নেই। তিনি মানুষের উপর বড়ই দয়াশীল। তিনি বাদশাহ। তাঁর মধ্যে কোনই আয়েব (দোষ-ত্রুটি) নেই। তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব-শেকায়েৎ হতে একেবারে পবিত্র।

---

১. অর্থাৎ, তাঁর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।
২. অর্থাৎ, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই যে তাঁর মোকাবিলা করতে পারে।

তিনি মানুষকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে থাকেন। তিনিই প্রকৃত সম্মানী। তিনিই প্রকৃত বড়। তিনি সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউই সৃষ্টি করেনি। তিনিই মানুষের সকল গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি জবরদস্ত ও পরাক্রমশালী। তিনি বড়ই দাতা। তিনিই সকলকে রুজি দেন এবং আহার দান করেন। তিনিই যার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি কম করে দেন আবার যার জন্য ইচ্ছে করেন রুজি বৃদ্ধি করে দেন। আবার কারো মান-মর্যাদা হ্রাস করে দেন। মান-সম্মান হ্রাস ও বৃদ্ধির অধিকারী তিনিই। অবমাননা, অসম্মান করার মালিকও তিনিই। তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। যে তাঁর সামান্য ইবাদতও করে, তিনি তার বড়ই কদর করেন, অর্থাৎ, ছওয়াব দেন। তিনি দু'আ কবূল করেন। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত। তাঁর আধিপত্য সকলের উপর ; তার উপর কারও আধিপত্য নেই। তাঁর হুকুম সকলেই মানতে বাধ্য; তাঁর উপর কারও হুকুম চলে না। তিনি যা কিছু করেন সকল কাজেই হিকমত থাকে, তাঁর কোন কাজই হিকমত ছাড়া হয় না। তাঁর সব কাজই ভাল। তাঁর কোন কাজে দোষের লেশ মাত্রও থাকে না। তিনি জীবনদাতা এবং তিনিই মৃত্যুদাতা। সিফাত (গুণাবলী) এবং নিদর্শন দ্বারা সকলেই তাঁকে জানে; কিন্তু তাঁর জাতের বারিকী বা সূক্ষ্মতত্ত্ব কেউই বুঝতে পারে না। তিনি গোনাহ্গারের তাওবা[১] কবূল করে থাকেন। যারা শাস্তির যোগ্য তাদেরকে শাস্তি দেন। তিনিই হিদায়াত করেন, অর্থাৎ, যারা সৎ পথে আছে তাদেরকে তিনিই সৎ পথে রাখেন। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, সমস্ত তাঁরই হুকুমে বরং তাঁর কুদরতে ঘটে থাকে। তাঁর কুদরত এবং হুকুম ব্যতীত একটি বিন্দুও নড়তে পারে না। তাঁর নিদ্রাও নেই তন্দ্রাও নেই। নিখিল বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর একটুও ক্লান্তি বোধ

---

১. ঘটনাক্রমে কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে আল্লাহ্পাকের নিকট অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনও আমি এরূপ কাজ করবো না, একেই 'তাওবা' বলে।

হয় না। তিনিই সমস্ত কিছু রক্ষা করছেন। ফলকথা, তাঁর মধ্যে যাবতীয় সৎ ও মহৎ গুণ আছে এবং দোষ-ত্রুটির নাম-গন্ধও তাঁর মধ্যে নেই। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে অতি পবিত্র।

৭। তাঁর যাবতীয় গুণ অনাদিকাল হতে আছে এবং চিরকালই থাকবে। তাঁর কোন গুণই বিলোপ বা কম হতে পারেনা।

৮। জ্বিন ও মানব ইত্যাদি সৃষ্টি বস্তুর গুণাবলী হতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র[১]। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে, যা আমাদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ্রও আছে বলে উল্লেখ আছে (যেমন, বলা হয়েছে-আল্লাহ্র হাত আছে) তথায় এরূপ ঈমান রাখা দরকার যে, এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন। আমরা বেশী বাড়াবাড়ি না করে এ ঈমান এবং একীন রাখবো যে, এর অর্থ আল্লাহর নিকট যাই হউক না কেন, তাই ঠিক এবং সত্য, তা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। এরূপ ধারণা রাখাই ভাল। তবে কোন বড় মুহাক্কিক আলিম এরূপ শব্দের কোন সুসঙ্গত অর্থ বললে তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বলা সকলের কাজ নয়। যারা আল্লাহ্র খাছ বান্দা তাঁরাই বলতে পারেন; তাও শুধু তারই বুদ্ধি মত; নতুবা আসল একীনী অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এরূপ শব্দ বা কথা বুঝে আসে না, এগুলোকে 'মুতাশাবেহাত' বলা হয়।

---

১. আল্লাহ্ স্রষ্টা। আল্লাহ্ ব্যতীত দৃশ্য-অদৃশ্য যতকিছু আছে, যথা আসমান, জমীন, ফিরিশতা, জ্বিন, মানব, চন্দ্র, সূর্য, আরশ, কুরসী, লৌহ ও কলম ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ্র সৃষ্ট পদার্থ। সমস্তই সাকার, সীমাবদ্ধ, ধ্বংসশীল এবং মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারে না বা আল্লাহ্র অনুরূপ কিছুই নেই। কুরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা কেউ আল্লাহ্কে অনুরূপ মনে করবে না। আল্লাহ্ এগুলো হতে বহু বহু উর্ধ্বে। মানবের বুদ্ধি বিবেকও আল্লাহ্র সৃষ্টি পদার্থ। সুতরাং মানবের বুদ্ধি-বিবেকের সীমা দ্বারা আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ নহেন। আল্লাহ্ অসীম, নিরাকার, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত ও তাঁর দেখা-শুনা, কথা বলা, হাসা, তাঁর হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি তিনি যেমন মহান এবং পবিত্র তাঁর এ সমস্ত গুণ ও তদ্রূপ মহান এবং পবিত্র।

৯। সমগ্র দুনিয়ার (ভাল-মন্দ যা কিছু হউক না কেন) সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা তা হওয়ার পূর্বেই আদিকাল হতে অবগত আছেন। তিনি যেরূপ জানেন তা সেরূপই পয়দা করেন একেই 'তাক্বদীর' বলে। আর মন্দ জিনিস পয়দা করার মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত আছে। যা সকলে বুঝতে পারে না।

১০। মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধি অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিবেচনা শক্তি এবং ভালমন্দ বিবেচনা করে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কাজ করার শক্তি দান করেছেন। এ শক্তি দ্বারাই মানুষ সৎ, বা অসৎ ছওয়াব বা গোনাহ্ নিজ ক্ষমতায় করে। কিন্তু কোন কিছু পয়দা করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। গোনাহ্র কাজে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং নেক কাজে সন্তুষ্ট হন।

১১। আল্লাহ্তা'আলা মানুষকে তাদের শক্তি বহির্ভূত কোন কাজ করার আদেশ করেননি।

১২। আল্লাহ্তা'আলার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু মেহেরবানী করে করেন, সমস্তই শুধু তাঁর কৃপা এবং অনুগ্রহ মাত্র। কিছু বান্দাদের নেক কাজে যে সমস্ত ছওয়াব নিজেই মেহেরবানী করে দিতে চান তা নিশ্চয় দিবেন, যেন তা ওয়াজিবেরই মত।

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা

১৩। বহুসংখ্যক পয়গম্বর মানব এবং জ্বিন জাতিকে সৎপথ দেখাবার জন্য আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন; আমাদেরকে তা বলা হয়নি। তাঁদের সত্যতার প্রমাণ (জনসাধারণকে) দেখাবার জন্য তাঁদের দ্বারা এমন কতিপয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কঠিন কঠিন কাজ প্রকাশ করা হয়েছে যে, তা অন্য লোক করতে পারে না। এ ধরনের কাজকে মু'জিযা বলে।

পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ), এবং সর্বশেষ ছিলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্যান্য সব পয়গম্বর এ দু'জনের মধ্যবর্তী সময়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন পয়গম্বরের নাম অনেক প্রসিদ্ধ যেমনঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইলয়াছ (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত যুলকিফ্ল (আঃ), হযরত ছালেহ্ (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শোআইব (আঃ)।

১৪। পয়গম্বরদের মোট সংখ্যা কত তা আল্লাহ্ ত'আলা কাউকেও বলেননি। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যত পয়গম্ব পাঠিয়েছেন, তা জানা থাক বা না থাক, সকলের উপরই আমাদের ঈমান রাখতে হবে। অর্থাৎ সকলকেই সত্য ও খাঁটি বলে মান্য করতে হবে। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পয়গম্বর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

১৫। পয়গম্বরদের মধ্যে কারও মর্যাদা কারও চেয়ে অধিক। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর পর আর কোন নতুন নবী কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না, আসতে পারে না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টি হবে, সকলের জন্যই তিনি নবী।

মি'রাজ সম্পর্কে আক্বীদা

১৬। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় এক রাতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা শরীফ হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং তথা হতে সাত আসমানের উপর এবং তথা হতে

যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী হয়েছিল সে পর্যন্ত নিয়ে আবার মক্কা শরীফে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একে 'মি'রাজ' শরীফ বলে।

ফিরিশ্‌তা সম্পর্কে আক্বীদা

১৭। আল্লাহ্ তা'আলা কিছু সংখ্যক জীব নূর দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের চর্ম চক্ষুর আড়ালে রেখেছেন। তাদেরকে 'ফিরিশ্‌তা' বলে। অনেক কাজ তাঁদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র হুকুমের খিলাফ কোন কাজ করেন না। আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে যে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন তাঁরা সে কাজেই লিপ্ত আছেন। সমস্ত ফিরিশ্‌তার মধ্যে চারজন ফিরিশ্‌তা অনেক প্রসিদ্ধ ঃ ১। হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ), ২। হযরত মিকায়ীল (আঃ), ৩। হযরত ইসরাফীল (আঃ), ৪। হযরত ইযরায়ীল (আঃ)।

জ্বিন সম্পর্কে আক্বীদা

আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছু সংখ্যক জীব অগ্নি দ্বারা পয়দা করেছেন, তাদেরকেও আমরা দেখতে পাই না। এদেরকে 'জ্বিন' বলা হয়। এদের মধ্যে ভাল-মন্দ, নেককার, বদকার সবরকমই আছে। এদের ছেলে-মেয়েও জন্মে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মশহূর দুষ্ট বদমাশ হলো ইবলীস।

অলীদের সম্পর্কে আক্বীদা

১৮। মুসলমান যখন অনেক ইবাদত বন্দেগী করে, গোনাহ্‌র কাজ হতে বেঁচে থাকে, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রাখে না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ তাবে'দারী করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দোস্ত এবং খাছ পিয়ারা বান্দায় পরিণত হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র 'অলী' বলে। আল্লাহ্‌র অলীদের দ্বারা কোন কোন সময় এ রকম অস্বাভিবিক কাজ হয়ে থাকে, যা সাধারণ লোক দ্বারা হতে পারে না, এ ধরনের কাজকে 'কারামাত' বলে।

১৯। অলী যত বড়ই হউক না কেন, কিন্তু নবীর সমান হতে পারে না।

২০। যত বড় অলীই হউক না কেন, যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক থাকে, সে পর্যন্ত শরী'অতের পাবন্দী করা তার উপর ফরয। নামায, রোযা, ইত্যাদি কোন ইবাদতই তার জন্য মাফ হতে পারে না। যে সকল কাজ শরী'অতে হারাম বলে নির্ধারিত আছে, তাও তাঁর জন্য কখনও হালাল হতে পারে না।

২১। শরী'অতের খিলাফ করে কিছুতেই আল্লাহ্‌র অলী হওয়া যায় না[১]। এরূপ 'খেলাফে শর'আ' (শরী'অত বিরোধী) লোক দ্বারা যদি কোন অদ্ভুদ ও অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হতে থাকে, তবে তা হয়তো যাদু না হয় শয়তানের ধোঁকাবাজী। অতএব এরূপ লোককে কিছুতেই বুযুর্গ মনে করা উচিত নয়।

২২। আল্লাহ্‌র অলীগণ কোন কোন ভেদের কথা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় জানতে পারেন, একে 'কাশ্‌ফ' বা 'এলহাম' বলে। যদি তা শরী'অত সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য , অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নয়।

বিদ্'আত কাকে বলে ?

২৩। আল্লাহ্ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন, হাদীছে দ্বীন (ধর্ম) সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বলে দিয়েছেন। এখন দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা আবিস্কার করা বৈধ নয়। এরূপ দ্বীন-সম্বন্ধীয় নতুন কথা আবিষ্কারকে 'বিদ'আত' বলে। যা বড়ই গোনাহ্।

কিতাব সম্পর্কে আক্বীদা

২৪। পয়গম্বরগণ যাতে নিজ নিজ উম্মতদিগকে ধর্মের কথা শিক্ষা দিতে পারেন, সেজন্য তাঁদের উপর আল্লাহ্‌তা'আলা ছোট, বড়

---

১. অনেক সময় জিন্ন তাবে' করে বা নফসের তাছাররোফের দ্বারা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করা হয়, এতে বুযুর্গী কিছুই নেই।

অনেকগুলো আসমানী কিতাব জিব্‌রায়ীল (আঃ) এর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে চারখানা কিতাব অতি প্রসিদ্ধ (১) তাউরাত, হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর। (২) যাবূর, হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর। (৩) ইঞ্জীল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর। (৪) কুরআন শরীফ, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। কুরআন শরীফই শেষ আসমানী কিতাব। কুরআনের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ হতে নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। অন্যান্য কিতাবগুলোতে গোমরাহ লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে, কিন্তু কুরআন শরীফ হিফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই নিয়েছেন। অতএব, একে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আক্বীদা

২৫। যে সকল মুসলমান ঈমানদার অবস্থায় আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন অতঃপর ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদেরকে সাহাবী বলে। সাহাবীদের অনেক মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আছে। তাঁদের সকলের সঙ্গে মহব্বত এবং ভক্তি রাখা আবশ্যক। তাঁদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদের কথা যদি কিছু শোনা যায় তা ভুল-ক্রটি বশতঃ হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কারণ, মানব মাত্রেই ভুল-ক্রটি হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের কারো নিন্দা করা যাবে না। সাহাবীদের মধ্যে চারজন সাহাবী সবচেয়ে বড়। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীন ইসলাম রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন, তাই তাঁকে প্রথম খলীফা বলা হয়। সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর তিনিই শীর্ষস্থানীয়। তারপর হযরত 'উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় খলীফা হন। তারপর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় খলীফা হন। তার পর হযরত 'আলী রযিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ খলীফা হয়েছিলেন।

২৬। সাহাবীদের মর্তবা এত উচ্চস্থানীয় যে, বড় হতে বড় অলী ছোট হতে ছোট সাহাবীর সমতুল্য হতে পারে না।

২৭। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পুত্র কন্যা এবং বিবি সাহেবাগণের প্রতিও সম্মান ও ভক্তি করা আমাদের কর্তব্য। সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্তুবা সার্বাপেক্ষা অধিক এবং বিবি ছাহেবানদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্তুবা সবচেয়ে বেশী।

যে কারণে ঈমান চলে যায়

২৮। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, সকল বিষয়কেই সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং মেনে নেওয়া ব্যতীত ঈমান ঠিক হতে পারে না। কোন একটি কথায়ও সন্দেহ পোষন করলে বা মিথ্যা বলে মনে করলে বা কিছু দোষ-ক্রটি ধরলে বা কোন একটি কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে মানুষ বে-ঈমান হয়ে যায়।

২৯। কুরআন হদীছের স্পষ্ট অর্থ অমান্য করে নিজের মত পোষণের জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ বদ্‌দ্বীনির কথা।

৩০। গোনাহ্‌কে হালাল জানলে ঈমান থাকে না।

৩১। গোনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, যে পর্যন্ত তা গোনাহ্ এবং অন্যায় বলে স্বীকার করবে, সে পর্যন্ত ঈমান একেবারে নষ্ট হবে না, অবশ্য ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে যাবে।

৩২। যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার (আযাবের) ভয় কিংবা (রহমতের) আশা নেই তারা কাফির।

৩৩। যে ব্যক্তি কারো কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞেস করে এবং তাতে বিশ্বাস করে, সে কাফির।

৩৪। গায়েবের কথা এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ অবগত নয়। হাঁ পয়গম্বর ছাহেবান অহী মারফত, ওলীআল্লাহ্গণ কাশ্ফও এলহাম মারফত এবং সাধারণ লোক লক্ষণ ও আলামত দ্বারা যে, কোন কোন কথা জানতে পারেন তা গায়েব নয়।

৩৫। কাউকে নির্দিষ্ট করে 'কাফির' কিংবা (নির্দিষ্ট করে) এরূপ বলা হয়, 'অমুকের উপর খোদার লা'নত হোক, অতি বড় গোনাহ্। তবে এরূপ বলা যেতে পারে যে, অত্যাচারীদের উপর খোদার লা'নত হউক। কিন্তু যাঁকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল কাফির বলেছেন, তাকে (নির্দিষ্টভাবে) কাফির বলা যেতে পারে। যথা-ফির'আউন। বা অন্য যাকে তাঁরা লা'নত করেছেন তার উপর লা'নত করা যেতে পারে।

প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আক্বীদা

৩৬। মানবের মৃত্যুর পর যদি কবর দেওয়া হয়, তবে কবর দেওয়ার পর আর যদি কবর দেওয়া না হয়, তবে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সে অবস্থাতেই তার নিকট মুনকার এবং নকীর নামক দু'জন ফিরিশ্তা এসে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার মা'বুদ কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি? এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? যদি মুরদা ঈমানদার হয়, তবেতো ঠিক ঠিক উত্তর দেয়। অতঃপর খোদার পক্ষ হতে তার জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। বেহেশ্তের দিকে ছিদ্রপথ করে দেওয়া হয়, তাতে সুশীতল বায়ু এবং নির্মল সুগন্ধ প্রবেশ করতে থাকে, আর সে পরম সুখের নিদ্রায় ঘুমাতে থাকে। আর মৃত ব্যক্তি ঈমানদার না হলে, সে সকল প্রশ্নের উত্তরেই বলে 'আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিনা।' অতঃপর তাকে কঠিন আযাব দেয়া হয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত সে কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর কোন কোন বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এরূপ পরীক্ষা হতে অব্যাহতি দিয়ে থাকেন : কিন্তু এ সকল ব্যাপারে মৃত ব্যক্তিই জানতে পারে, আমরা

কিছুই অনুভব করতে পারি না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখতে পায়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় তার নিকটে থেকেও তা দেখতে পাই না।

৩৭। মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় তার আমল ও স্থায়ী বাসস্থান দেখানো হয়। যে বেহেশ্তী হবে তাকে বেহেশ্ত দেখিয়ে তার আনন্দ বর্ধন করা হয়, দোযখীকে দোযখ দেখিয়ে তার কষ্ট এবং অনুতাপ আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়।

৩৮। মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ বা কিছু দান খয়রাত করে তার ছওয়াব তাকে বখশিয়া দিলে তা সে পায় এবং তাতে তার খুবই উপকার হয়।

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আক্বীদা

৩৯। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল কিয়ামতের যে সমস্ত 'আলামত বর্ণনা করেছেন তা সবই নিশ্চয় ঘটবে। ইমাম মাহ্দী (আঃ) আগমন করবেন এবং অতি ন্যায়পরায়নতার সাথে রাজত্ব করবেন। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, সে দুনিয়ার মধ্যে বড় ফেৎনা ফাসাদ করবে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হতে অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। ইয়াজুজ মাজুজ (এক জাতি) সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, সব তছনছ করে দিবে। অবশেষে খোদার গযবে ধ্বংস হবে। এক অদ্ভুদ জীব মাটি ভেদ করে বের হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে। সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে এবং পশ্চিম দিকেই অস্ত যাবে। কুরআন মাজীদ উঠে যাবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করবে। শুধু কাফিরই কাফির থেকে যাবে। তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। এ রকম আরো অনেক 'আলামত আছে।

কিয়ামত সংগঠিত হওয়া সম্পর্কে আক্বীদা

৪০। যখন সমস্ত আলামত প্রকাশ পাবে, তখন হতে কিয়ামতের আয়োজন শুরু হবে। হযরত ইস্রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। এই

সিঙ্গা শিং-এর আকারের প্রকাণ্ড এক রকম জিনিস। প্রথম বার সিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান যমীন সমস্ত জিনিষ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যাবতীয় সৃষ্ট জীব মারা যাবে। যারা পূর্বে মারা গেছে তাদের রূহ বেহুশ হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাবেন সে নিজের অবস্থাই থাকবে। এ অবস্থায় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবে।

হাশরের ময়দান সম্পর্কে আক্বীদা

৪১। আবার যখন আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত আলম (জগত) পুনরায় সৃষ্টির ইচ্ছা করবেন, তখন দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সমস্ত আলম জীবিত হয়ে উঠবে। সমস্ত মৃত লোক জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে এবং তথাকার অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, সুপারিশ করাইবার জন্য পয়গম্বরদের নিকট যাবে কিন্তু সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। পরিশেষে আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি নিয়ে সুপারিশ করবেন। নেকী-বদি পরিমাপের জন্য মীযান (পাল্লা) স্থাপন করা হবে। ভাল-মন্দ সমস্ত কর্মের পরিমাণ ঠিক করা হবে এবং তার হিসেব হবে। কেউ কেউ বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাবে। নেককারদের আমলনামা তাঁদের ডান হাতে এবং গোনাহ্‌গারদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (নেক) উম্মতকে হাউযে কাউছারের পানি পান করাবেন। সে পানি দুধ হতেও সমধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সকলকে পুলছিরাত পার হতে হবে। নেককারগণ সহজে তা পার হয়ে বেহেশ্‌তে পৌঁছবেন, আর পাপীরা তার উপর হতে দোযখের মধ্যে পরে যাবে।

দোযখ সম্পর্কে আক্বীদা

৪২। দোযখ এখনও বর্তমান আছে। তাতে সাপ, বিচ্ছু এবং আরও অনেক কঠিন কঠিন আযাবের ব্যবস্থা আছে। যাদের মধ্যে সামান্য হলেও

ঈমান থাকবে, যত বড় গোনাহ্‌গারই হোক না কেন, তারা নিজ নিজ গোনাহ্‌র পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নবীগণের এবং বুযুর্গদের সুপারিশে নাজাত পেয়ে বেহেশ্‌তে যাবে। আর যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান নেই, অর্থাৎ, যারা কাফির ও মুশরিক, তারা চিরকাল দোযখের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। সেখানে তাদের আযাব কমও হবে না এবং মৃত্যুও হবে না।

বেহেশ্‌ত সম্পর্কে আক্বীদা

৪৩। বেহেশ্‌ত এখনও বিদ্যমান আছে। সেখানে বিভিন্ন সুখ-শান্তি এবং আমোদ-প্রমোদের অসংখ্য উপকরণ আছে। যারা বেহেশ্‌তী হবেন, কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা তাদের থাকবে না। সেখানে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবেন। তাদেরকে কখনও তথা হতে বহিষ্কার করা হবে না ; আর সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না।

৪৪। ছোট হতে ছোট গোনাহ্‌র কারণেও আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন। আবার বড় হতে বড় গোনাহ্‌ও মাফ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার সব কিছুরই ক্ষমতা আছে।

৪৫। শিরক্ এবং কুফরির গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকেও মাফ করবেন না ; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। তাঁর কোন কাজে কেউ বাধা দিতে পারে না।

৪৬। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করে বেহেশ্‌তী বলেছেন, তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকেও আমরা সুনিশ্চিতভাবে বেহেশ্‌তী বলতে পারিনা। তবে নেক আলামত দেখে (অর্থাৎ আমল আখলাক ভাল হলে) ভাল ধারণা এবং আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করা কর্তব্য।

৪৭। বেহেশ্‌তে আরামের জন্য অসংখ্য নিয়ামত এবং অপার আনন্দের অগণিত সামগ্রী বিদ্যমান আছে। সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে

অধিক আনন্দদায়ক নেয়ামত হবে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ। বেহেশ্‌তীদের ভাগ্যে এ নিয়ামত জুটবে। এ নিয়ামতের তুলনায় অন্যান্য নিয়ামত কিছুই নয় বলে মনে হবে।

আল্লাহ্‌র দীদার সম্পর্কে আক্বীদা

৪৮। জাগ্রত অবস্থায় চর্ম-চক্ষে এ দুনিয়ায় কেউই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেনি, দেখতে পারেও না। বেহেশ্‌তে বেহেশ্‌তীগণ দেখতে পারেন।

৪৯। সারা জীবন যে যেরূপই হউক না কেন, কিন্তু যার খাতিমা অর্থাৎ, অন্তিম অবস্থা ভাল হবে, সেই ভাল এবং সে পুরস্কারও ভাল পাবে। যার খাতিমা মন্দ হবে (অর্থাৎ, বেঈমান হয়ে মরবে) সেই মন্দ এবং তাকে মন্দ ফলও ভোগ করতে হবে।

৫০। সারা জীবনের মধ্যে মানুষ যখনই তাওবা[১] করুক বা ঈমান আনুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করেন, কিন্তু মৃত্যুকালে যখন প্রাণ বের হতে থাকে এবং আযাবের ফেরেশ্‌তাকে নজরে দেখতে পায়, তখন তাওবাও কবূল হয় না এবং ঈমানও কবুল হয় না।

ভ্রান্ত আক্বীদা

সহীহ্ ঈমান এবং আক্বায়েদের বর্ণনার পর কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা ও খারাপ প্রথা এবং কিছু সংখ্যক বড় বড় গোনাহ্ যা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং যার কারণে ঈমানের সর্বাত্মক ক্ষতি হয়, তার বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, যেন জনগণ সে সব হতে বেঁচে থাকতে পারে। এর মধ্যে

১. গোনাহ পরিত্যাগ করতঃ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাকে তাওবা বলে এবং কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহ্, রাসূল এবং ইসলাম ধর্মের বিধানাবলী মানার অঙ্গীকার করাকে 'ঈমান' বলে।

কোনটিতো একেবারেই কুফর ও শিরক্‌মূলক। কোনটি প্রায়ই কুফর ও শিরকমূলক। কোনটি বিদ'আত এবং গোমরাহী। আর কোনটি শুধু গোনাহ্। মোটকথা, এর সবগুলোর হতেই বেঁচে থাকা একান্ত আবশ্যক। আবার যখন এগুলোর বর্ণনা শেষ হবে। তখন গোনাহ্ করলে দুনিয়াতেই যে সব ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করলে দুনিয়াতেই যে সব লাভ হয়, তা সংক্ষেপে বর্ণিত হবে। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার লাভ-লোকসানের দিকেই বেশী লক্ষ্য করে থাকে, তাই হয়তো কেউ এ ধারণায়ও কোন কোন নেক কাজ করতে পারে বা কোন গোনাহ্ হতে দূরে থাকতে পারে।

শির্‌ক ও কুফ্‌র

কুফ্‌র পছন্দ করা। কুফরী কোন কাজ বা কথাকে ভাল মনে করা[১]। অন্য কারো দ্বারা কুফ্‌রমূলক কোন কাজ করান বা কুফ্‌রমূলক কোন কথা বলান। কোন কারণবশতঃ নিজের মুসলমান হওয়ার উপর আপেক্ষ করা, যে, হায় ! যদি মুসলমান না হতাম, তবে এ রকম উন্নতি লাভ করতে পারতাম বা এ রকম সম্মান পেতাম। ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। সন্তান বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে এ রকম কথা বলা 'খোদা তা'আলা মারার জন্য সংসারে আর কাউকে পায় নাই, ব্যস একেই পেলো, এর জীবনটা লওয়াই খোদা তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এ রকম করা ভাল হয়নি বা উচিত ছিলনা, এরকম জুলুম কেউ করে না। ইত্যাদি। আরও অনেক বেহুদা কথা যা সাধারণতঃ মুর্খেরা শোকে বিহবল হয়ে বলে থাকে।

খোদা বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হুকুমকে মন্দ জানা বা তার মধ্যে কোন প্রকার দোষ বের করা। কোন নবী বা

১. আজকাল কোন কোন ধর্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী যুবক হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রশংসা করে ইসলামের নিন্দা করে থাকে। এতে ঈমান থাকে না।

ফিরিশ্‌তাকে ঘৃণা করা বা তুচ্ছ মনে করা। কোন অলী বা বুযুর্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় তিনি সব সময় আমাদের সকল অবস্থা জানেন। গণক কিংবা যার উপর জ্বিনের আছর হয়েছে, তার নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞেস করা বা হাত ইত্যাদি দেখিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করান এবং তাতে বিশ্বাস করা। কোন বুযুর্গের কালাম হতে ফাল বের করে তাকে দৃঢ় সত্য মনে করা। কোন পীর বা অন্য কাউকে দূর হতে ডেকে মনে করা যে, তিনি আমার ডাক শুনেন। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাউকে লাভ লোকসানের ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও নিকট নিজের মকছুদ টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি, রুযি-রোযগার সন্তান ইত্যাদি চাওয়া। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাউকে সিজদা করা। কারও নামে রোযা রাখা বা কারও নামে গরু ছাগল ইত্যাদি কোন জানোয়ার ছেড়ে দেয়া বা দরগাহে মান্নত মানা। কোন কবর বা দরগাহ্‌ বা পীর-বুযুর্গের ঘরের তাওয়াফ করা। (অর্থাৎ, চতুর্দিকে ঘোরা) খোদা বা রাসূলের হুকুমের উপর অন্য কারও হুকুমকে বা কোন দেশ-রেওয়াজ বা সামাজিক প্রথাকে বা নিজের কোন পুরাতন অভ্যাসকে বা বাপ-দাদার কালের কোন দস্তুরকে পছন্দ বা অবলম্বন করা। কারও সামনে সম্মানের জন্য (সালাম ইত্যাদি করিবার সময়) মাথা নোয়ানো বা কারও সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা। কারও নামে কোন জানোয়ার যবাহ্‌ করা। উপরি দৃষ্টি বা জ্বিনের আছর ছাড়াইবার জন্য তাদের ভেট (নযরানা বা ভোগ) দেয়া। কা'বা শরীফের মত অন্য কোন জায়গার আদব বা তা'যীম করা। কারও নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা ও বালি, বোলাক ইত্যাদি পরানো। কারও নামে বাজুতে পয়সা বা গলায় সূতা বাঁধা। নতুন বরের মাথায় সাহরা অর্থাৎ, ফুলের মালা বাঁধা। (এটা হিন্দুদের রসম) টিকি রাখা। (কারও নামে চুল রাখা,) কারও নামে ফকীর বানান। আলী বখশ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা। (এরূপ এক কড়ি, বদন, পবন, গমন ইত্যাদি নাম রাখা) কোন

প্রাণীর নাম কোন বুযুর্গের নাম অনুযায়ী রাখিয়া তার তা'যীম করা। পৃথিবীতে যা কিছু হয়, নক্ষত্রের তাছীরে হয় বলে মনে করা। ভাল বা মন্দ দিন তারিখ জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা জিজ্ঞাসা করা[১]। কোন মাস বা তারিখকে মনহুছ (খারাপ) মনে করা। কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপা। এরূপ বলা, যদি খোদা রাসূল চায়, তবে এ কাজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, খোদার সঙ্গে রাসূলকেও শামিল করা। কারও নামের বা মাথার কসম খাওয়া। ছবি রাখা বিশেষতঃ বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা এবং তার তা'যীম করা। এর কোনটা কুফর, আবার কোনটা শিরক।

বিদ্‌'আত ও কু-প্রথা

কোন বুযুর্গের দরগায় ধুমধামের সাথে মেলা বা ওরস করা। বাতি জ্বালান। মেয়েলোকের তথায় যাওয়া। চাদর দেওয়া। কবর পাকা করা। কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর কবরকে অতিরিক্ত তা'যীম করা। কবর বা তা'যীয়া চুম্বন করা। কবরের মাটি শরীরে মাখা। তা'যীমের জন্য কবরের চারিদিকে তাওয়াফ করা (ঘোরা)। কবর সিজদা করা। কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া। মিঠাই ইত্যাদি দরগাতে মান্নত করা বা দেওয়া। তাযিয়া নিশান ইত্যাদি রেখে তার উপর হালুয়া, বাতাশা প্রভৃতি রাখা। তাকে সালাম করা। কোন জিনিসকে অচ্ছুৎ লাগান। শুধু নিরামিষ খাওয়া, মাছ-গোস্ত না খাওয়া। স্বামীর কাছে না যাওয়া। লাল কাপড় না পড়া ইত্যাদি। বিবি ফাতেমার নামে ফাতেহার উদ্দেশ্যে মাটির বরতনে খানা রাখাকে ছেহ্‌নক বলে, এটা করা এবং তা হতে পুরুষদেরকে খেতে না দেয়া। প্রকাশ থাকে যে, এমন করাটা মেয়েদের জন্যও জায়িয নেই। কেউ মারা গেলে তিজা, চল্লিশা, কুলখানী জরুরী মনে করে করা। (অর্থাৎ, ৩দিনের দিন বা ৪০ দিনের দিন মোল্লা মুন্সী বা যারা দাফন করতে আসে, জরুরী মনে করে তাদেরকে খাওয়ান বা বদনামীর ভয়ে ধুমধামের সাথে যিয়াফত করা।) বিবাহের সময়, খান্দার

---

১. যেমন প্রথা আছে যে, হাত চুলকালে হাতে টাকা আসবে। হাঁচি দিলে কার্য সিদ্ধি হবে না। ডান চোখ লাফালে ভাল হবে, বাম চোখ লাফালে বিপদ আসবে।

সময়, বিস্‌মিল্লাহর সবক দেওয়ার সময়, কেউ মারা গেলে, অসাধ্য সত্ত্বেও খান্দানী রসমসমূহ বজায় রাখা। সামাজিক প্রথাগুলি ঠিক রাখা। বিশেষতঃ টাকা কর্জ করিয়া নাচ-গান রং-তামাশা ইত্যাদি করান। হিন্দুদের কোন পূজা বা তেহার, হুলি, দেওয়ালী বা খৃষ্টানদের বড় দিন বা বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা বিয়ের মুখ দেখানো বা অন্যান্য অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগদান করা। 'আসসালামু আলাইকুম, না বলে তার পরিবর্তে, আদাব নমস্কার, প্রণিপাত ইত্যাদি বলা অথবা কেবল হাত উঠিয়ে মাথা ঝুঁকান[১]। দেওর, ভাশুর, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই, খালাতো ভাই, ননদের স্বামী, নুনাযের স্বামী, বা ধর্ম ভাই, ধর্ম বাপ, প্রভৃতির বা অন্য কোন না-মাহরম[২] আত্মীয়ের সাথে দেখা দেওয়া। গান বাদ্য শোনা, নাচ দেখা বা তাদের গান বাদ্যে বা নাচে সন্তুষ্ট হয়ে বখ্‌শিশ দেয়া। নিজের বংশের গৌরব করা বা কোন বুযুর্গের খান্দানের হওয়া বা বুযুর্গের কাছে শুধু মুরীদ হওয়াকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা। কারও বংশের মধ্যে দোষ থাকলে তা বের করে নিন্দা করা। কোন জায়িয পেশাকে অপমানজনক মনে করা। (যেমন, মাছ বিক্রি করা, মজদুরী করা, জুতা সেলাই করা ইত্যাদি) কারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা। বিবাহ-শাদীতে বেহুদা খরচ করা এবং অন্যান্য যে সব বেহুদা কাজ আছে তা করা। যেমন পণ (যৌতুক) লওয়া, খরচ বাবদ লওয়া, ঘাট-সেলামী, আগবাড়ানী, অন্দর সেলামী, হাত ধোয়ানী, চিনি-মুখী প্রভৃতি বেহুদা খরচ আদায় করা। সুন্নাত তরীকা ছেড়ে দিয়ে এতদ্দেশে যে সব প্রথা প্রচলিত আছে, তা পালন করা। নওশাকে শরী'অতের খেলাপ পোষাক পরান। বরের হাতে কাঙ্গন বাঁধা, মাথায় ছহরা বাঁধা। বরের হাতে মেহেন্দী

১. এসকল কুসংস্কার হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে এসেছে। এরকম আরও অনেক কুসংস্কার মূর্খতাবশতঃ সমাজে ঢুকেছে। যেমন- যে দিন ধান বুনে সে দিন খৈ ভাজে না, যে হাঁড়িতে করে তিল বুনে সে হাঁড়ি বাড়ীতে আনলে মাটিতে রাখে না, কলাগাছ লাগানোর সময় উপরের দিকে দেখে না, নারিকেল, সুপারী, পান গাছ লাগায় না, ইত্যাদি।
২. শরী'অত মত যাদের সঙ্গে বিবাহ জায়িয তাদেরকে 'না-মাহরম' বলে।

লাগান। আতশবাজী ফুটান ইত্যাদি অনর্থক কাজে টাকা অপব্যয় করা। বরকে বাড়ীর ভিতর এনে তার সামনে না-মাহরম মেয়েলোকের আসা। এরূপ পরপুরুষের সামনে বৌয়ের মুখ দেখানো বা অন্যান্য আত্মীয়দের এনে বৌ দেখান আরও গর্হিত কর্ম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দুলহাকে দেখা। বয়স্কা শালীদের সামনে আসা এবং হাসি ঠাট্টা করা। চৌথী খোলান, যে ঘরে বর ও কনে শয়ন করে, সে ঘরের আশেপাশে থেকে তাদের কথা-বার্তা শোনা বা উঁকি দিয়ে দেখা এবং যদি কোন কথা জানতে পারে, তবে অন্যকে জানানো। বিয়ের সময় লজ্জায় নামায পর্যন্ত ত্যাগ করা। শোকে-দুঃখে চীৎকার করে ক্রন্দন করা বা বুক চাপড়াইয়া বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলা। যে সব কাপড় মৃতের গায়ে লাগিয়াছে সে সব নাপাক না হলেও ধোয়া জরুরী মনে করা। যে গৃহে লোক মারা গেছে সে ঘরে বৎসর খানেক বা কিছু কম বেশী দিন না যাওয়া বা কোন খুশীর কাজ (যেমন, বিবাহ ইত্যাদি) না করা। নির্দিষ্ট তারিখে আবার শোককে তাজা করা। অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা। সাদাসিদা লেবাস-পোশাককে ঘৃণা করা। ঘরে জীব-জন্তুর ছবি লাগান। সোনা-রুপার পানদান, সুরমাদান, বাসন, পেয়ালা ব্যবহার করা। শরীর দেখা যায় এইরূপ পাতলা কাপড় পরিধান করা। বাজনদার অলংকার ব্যবহার করা। পুরুষদের সভায় মেয়েদের যাওয়া। বিশেষতঃ তা'যিয়া, ওরস বা মেলা দেখতে যাওয়া। স্ত্রীলোকদের এরূপ পোশাক পরা যাতে পুরুষের মত দেখা যায় এবং পুরুষদের এমন পোশাক পরা যাতে স্ত্রীলোকের মত দেখা যায়। শরীরে গুদানী দেওয়া (উলকি আঁকা)[১]। বিদেশে যাবার সময় বা বিদেশ হতে এসে কোন 'না-মাহরমের' সঙ্গে মোসাবাহা বা মো'আনাকা করা[২]। সন্তান জীবিত থাকার জন্য তার নাক-কান ছিদ্র করা। পুত্র সন্তানকে বালা, ঘুগরা ইত্যাদি অলংকার পরান বা রেশমী কাপড় পরান। বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আফিম বা নিশাদার জিনিস খাওয়ান। এ রকম আরও

১. শরীরে কোন জীবের ছবি বা নাম অঙ্কন করা।
২. আলিঙ্গন করা বা হাত মিলানো।

অনেক বিষয় আছে, কোনটি শিরক ও কুফ্‌রমূলক, আর কোনটি বিদ'আত ও হারাম। চিন্তা করলে বা কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করলে বেশী জানা যাবে। নমুনা স্বরূপ এতটুকু বর্ণনা করা হলো।

কতিপয় বড় বড় গোনাহ্

খোদার সঙ্গে অপর কাউকেও শরীক করা। অনর্থক খুন করা। (মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা বা বান মেরে যে কাউকে মারা হয় তাতেও খুন করার গোনাহ্ হবে।) বন্ধ্যা রমণীর এমন টোটকা করা যে, অমুকের সন্তান মরে যাবে এবং তার সন্তান পয়দা হবে, এটাও খুনের শামিল। মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। যিনা (ব্যভিচার) করা। এতীমের মাল খাওয়া, যেমন, অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিনী হয়ে বসে এবং নাবালেগ ছেলেমেয়েদের অংশে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করে। মেয়েদের হক বা অংশ না দেওয়া। সামান্য কারণেই কোন স্ত্রীলোকের উপর যিনার তোহ্‌মত (দোষ) দেওয়া। কার উপর জুলুম করা। অসাক্ষাতে কারও বদনাম করা। আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া। ওয়াদা করে তা পুরা না করা। আমানতে খিয়ানত করা। খোদা তা'আলার কোন ফরয, যেমন-নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়া। কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। মিথ্যা কথা বলা। বিশেষতঃ মিথ্যা কসম খাওয়া। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কসম খাওয়া বা এরকম কসম খাওয়া যে, মরণকালে যেন কালিমা নছীব না হয়, বা ঈমানের সাথে মউত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সিজদা করা। বিনা উযরে নামায ক্বাযা করা। কোন মুসলমানকে বে-ঈমান কাফের বা খোদার দুশমন বলা বা এ রকম বলা যে, তার উপর খোদার লা'নত হউক, খোদার গযব পড়ুক। কারও নিন্দাবাদ, গীবত শেকায়েত করা বা শোনা। চুরি করা। সূদ খাওয়া। ঘুষ খাওয়া। ধান-চাউলের দর বাড়লে মনে মনে খুশী হওয়া। দাম ঠিক করে আবার

পরে কম নেওয়া (যেমন সাধারণতঃ নামের জন্য বড় লোকেরা গরীব লোকদের সঙ্গে করে থাকে।) না-মাহরমের[১] কাছে নির্জনে একাকী বসা। জুয়া খেলা। কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজ (প্রথা) পছন্দ করা। খাবার কোন জিনিসকে মন্দ বলা। নাচ দেখা। গান-বাদ্য শোনা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নসীহত না করা। হাসি-তামাশা করে কাউকেও লজ্জা দেওয়া এবং অপমানিত করা। পরের দোষ দেখা। ইত্যাদি কবীরা (বড়) গোনাহ্।

গোনাহ্‌র কারণে পার্থিব ক্ষতি

গোনাহ্‌র কারণে ইল্‌ম হতে মাহ্‌রূম থাকতে হয়। রুজিতে বরকত হয় না। ইবাদতে মন বসে না। নেক লোকের সংসর্গ ভাল লাগে না। অনেক সময় কাজে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অন্তর পরিষ্কার থাকে না। ময়লা পড়ে যায়, মনের সাহস কমে যায়, এমন কি, অনেক সময় মনের দুর্বলতা হেতু শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। মনে স্ফুর্তি থাকে না। নেক কাজ ও ইবাদত বন্দেগী হতে মাহ্‌রূম থাকে। আয়ু কমে যায়। তাওবা করার তাওফীক হয় না। গোনাহ্ করতে করতে শেষে গোনাহ্‌র কাজের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না, বরং ভাল বলে বোধ হতে থাকে। এরূপ হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। একজনের গোনাহ্‌র দরুন অন্যান্য লোক, এমন কি, অন্যান্য জীব-জন্তুরও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। পরে তাদের বদ দু'আ ও লা'নতে (অভিশাপে) পড়তে হয়। জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ হতে তার প্রতি লা'নত হতে থাকে। ফিরিশতাগণের দু'আ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। দেশে শস্য, ফসলাদির উৎপাদন কম হয়। লজ্জা-শরম কম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। নানারূপ

---

১. যাদের সাথে পর্দা করা ফরয এবং বিয়ে জায়িয।

বিপদ-আপদ বালা-মুসীবতে জড়িয়ে ধরে। শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। দিল পেরেশান থাকে। মৃত্যুকালে মুখ দিয়ে কালিমা বের হয় না। খোদার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়। পরিশেষে বিনা তাওবায় মারা যায়। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

নেক কাজে পার্থিব লাভ

সর্বদা নেক কাজে মশগুল থাকলে রিযিক বৃদ্ধি পায়। সকল কাজে বরকত হয়ে থাকে। মনের অশান্তি ও কষ্ট দূর হয়। মনের আশা সহজে পূরণ হয়। জীবনে শান্তি লাভ হয়। রীতিমত বৃষ্টিপাত হয়। সকল প্রকার বালা-মুসীবত, বিপদ-আপদ দূর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবান এবং সহায় হন। তার হৃদয় মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাকে আদেশ করেন। মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সকলে তাকে ভালবাসে। কুরআন শরীফ তার রোগ আরোগ্যের উছীলা হয়। টাকা পয়সার দিক দিয়ে কোনরূপ ক্ষতি হলে, তা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিস পাওয়া যায়। দিন দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত তার জন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধন-দৌলত বৃদ্ধি পায়। মনে শান্তি বজায় থাকে। তার উছীলায় পরবর্তী বংশধরদের অনেক উপকার হয়। জীবিত অবস্থায় স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় গায়েবী বাশারত (সুসংবাদ) পায়।

মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তা খোশখবরী (সুসংবাদ) শোনায় এবং ধন্যবাদ দেয়। আয়ু বৃদ্ধি হয়। দরিদ্রতা এবং অনাহারজনিত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ দূর হয়।

হে খোদা ! নিজ রহমতে আমাদেরকে যাবতীয় গোনাহর কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনার সন্তুটির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কামেল মুমেনের জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যখন অহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত অহী শোনার জন্যে অপেক্ষা করলাম। অহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতে লাগলেন।

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে বেশী দাও, কম দিওনা। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর, লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর, বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের ওপর অধিকার দাও, অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুটিতে সন্তুষ্ট কর।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এই আয়াতসমূহের উপর পুরোপরি আমল করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী (রাহঃ) তাফসীর অধ্যায়ে ইয়াযীদ ইবনে বাবনূস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র কিরূপ ছিল ? তিনি বললেন ঃ তাঁর চরিত্র (অর্থাৎ, স্বভাবগত অভ্যাস) কুরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে

বললেন ঃ এগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও অভ্যাস। (ইবনে কাছীর)

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায়

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

فلاح-(সাফল্য) শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও ইকামাতে দৈনিক পাঁচবার حى على الفلاح বলে প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়। فلاح এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।-(কামূস) এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূর প্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশী কোন কিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা, এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতে কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গাম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্যে সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নে'আমতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থেকে কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সেখানেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতিক্ষায় পূর্ণ হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ, তারা যা চাইবে তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ -

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন নিশ্চয়ই আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী এবং নিজ দয়ায় আমাদেরকে এমন স্থানে দাখিল করেছেন, যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এই আয়াতের আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হল। কুরআনপাকের সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করবে যে নিজকে পরিশুদ্ধ করে) অর্থাৎ, নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াকেই (পরকালের ওপর) অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ পরকাল উত্তম ; (কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে) এবং পরকাল চিরস্থায়ী।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্যতো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে, দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ, সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করা, এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌তা'আলা সে সব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা করেছেন, যারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত মুমিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে, একথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যতঃ কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ কষ্টভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি ? এই প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীনই হবে না ; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেযগার সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই ; অর্থাৎ, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে ? অতএব পরিণামের ওপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যে সব সজ্জন উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিনামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে থাকে। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

প্রথম গুণ

নামাযে খুশূ অবলম্বন করা

আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন ঃ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

আয়াতের তরজমা

যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।

অর্থাৎ, যারা নামাযে (চাই ফরজ হোক কিংবা নফল) বিনয়-নম্র।

খুশূ কাকে বলে

'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরী'অতের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা ; অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না করা। (বয়ানুল-কুরআন) বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফেকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া "নামাযের মাকরূহ্‌সমূহ" শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য ইমাম থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলতঃ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণতঃ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশূ। হাদীছে হযরত আবু যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযের সময় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেয়। যখন সে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেয়, তখন আল্লাহ্‌তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। (আহমদ, নাসায়ী আবু দাউদ, মাযহারী)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন ঃ সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ করো না। (বায়হাকী, মাযহারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে

বললেন ঃ لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ অর্থাৎ, এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত। (মাযহারী)

নামাযের খুশুর প্রয়োজনিয়তার স্তর

ইমাম গাযযালী (রহঃ), কুরতুবী (রহঃ) এবং অন্য আরও কয়েক জন ইমাম বলেছেন যে, নামাযে খুশূ ফরয। সম্পূর্ণ নামায খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাযই হবে না। অন্যেরা বলেছেন ঃ খুশূ নিঃসন্দেহে নামাযের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামায নিষ্প্রাণ, কিন্তু একে নামাযের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাযই হয় না এবং পুনরায় পড়া ফরয।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বয়ানুল কুরআনে বলেছেন, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরয নয়, কিন্তু নামায কবুল হওয়া খুশূর ওপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরয। ইমাম তাবরানী (রহঃ) 'মু'জামে কাবীরে' হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোন খুশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

দ্বিতীয় গুণ

অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

আয়াতের তরজমা

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা অনর্থক বিষয়াদি থেকে (চাই তা উক্তিগত তথা কথা-বার্তার অন্তর্ভুক্ত হোক কিংবা কর্মগত অর্থাৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত হোক। বিরত থাকে।

অনর্থক কথা ও কাজের হুকুম

لغو এর অর্থ, অনর্থক কথা অথবা অনর্থক কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকারতো নেই-ই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মন্ডিত হতে পারে।' এ কারনেই আয়াতে একে কামেল মুমিনের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ

যাকাত আদায় ও আত্মশুদ্ধি করা

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

আয়াতের তরজমা

যারা যাকাত দান করে থাকে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা কর্ম ও চরিত্রে তাদের আত্মশুদ্ধি করে।

যাকাত কি ও কেন

زَكٰوة এর আভিধানিক অর্থ, পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কুরআনপাকে এই শব্দটি সাধারণতঃ এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি, মদীনায় হিজরতের পর ফরয হয়েছে। ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই দেয়া হয় যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থির করা হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য এটাই। আর যারা বলেন যে, মদীনায় পৌছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এস্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ, পবিত্র করা নিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত তাফসীরে এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণতঃ কুরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে ايتاء - يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ও اٰتُوا الزَّكٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া فاعلون শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فعل (কাজ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত فعل নয়; অর্থ-কড়ির একটা অংশ। فاعلون শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে

পারিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্যে অপরিহার্য ফরয তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফস পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ্‌। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ

যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ -

আয়াতের তরজমা

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে ; তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা তাদের যৌনাঙ্গকে অবৈধ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা থেকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও শরী'অত সম্মত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত রাখে না। কেননা এ ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। হ্যাঁ যারা এদেরকে ছেড়ে অন্যত্র কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক হবে, তারা শরী'অতের সীমালংঘনকারী হবে।

যৌনাঙ্গের হারাম ও হালাল ব্যবহার

যারা স্ত্রী ও শরী'অত সম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরী'অতের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অর্থাৎ, যারা শরী'অতের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে। জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না। والله اعلم

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরী'অতসম্মত দাসীর সাথে শরী'অতের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অন্য কোন পথ ও পন্থা হালাল নয় ; যেমন যিনা, তেমিন হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে استمناء باليد অর্থাৎ, হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

পঞ্চম গুণ

আমানত প্রত্যর্পন করা

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

আয়াতের তরজমা

এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা গচ্ছিত আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি (যা কোন কাজ কারবার প্রসঙ্গে কিংবা এমনিতেই প্রাথমিক পর্যায়ে করে) সজাগ থাকে।

আমানত কি ও কেন

আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির ওপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে আমানতের সকল প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল-ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত আমানত হোক।

আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত আমানত

আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরী'অত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা। এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা।

বান্দার হক সম্পর্কিত আমানত

বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত ; অর্থাৎ, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরী'অতসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমনতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্যে পারস্পারিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরী ও চাকুরীর জন্যে নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে,

আমানতের হেফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূর প্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ

অঙ্গীকার পূর্ণ করা

অঙ্গীকার বলতে প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয় ; অর্থাৎ, একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরী'অতের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীছ শরীফে আছে اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ, ওয়াদা, এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরী'অতসম্মত উযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্‌।

চুক্তি ও ওয়াদার পার্থক্য

উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরী'অতসম্মত উযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্‌।

সপ্তম গুণ

নামাযে যত্নবান হওয়া

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ -
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

আয়াতের তরজমা

এবং যারা তাদের নামায হেফাজত করে, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের (শীতল ছায়াময় উদ্যানের) উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

অর্থাৎ, যারা তাদের ফরয নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা সুউচ্চ ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

নামাযের গুরুত্ব

নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায, মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রূহুল-মা'আনী) এখানে صلوات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صلوة শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নাত কিংবা নফল হোক, নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া তথা খুশূ। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে আল্লাহ্‌র সকল হক ও বান্দার সকল হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দী ও নিয়ম-নীতি সহকারে

আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

জান্নাতের সুনিশ্চিত সুসংবাদ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চীরকাল থাকবে। উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল- ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। قد افلح বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুনাবলী পুরোপরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

সমাপ্ত

একজন আল্লাহ্ওয়ালার বিস্ময়কর আত্মকাহিনী

মূল
মওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহঃ)
সম্পাদক ঃ মাসিক আল ফুরকান (উর্দূ)

অনুবাদ
মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান
দাওয়া ও ইফতা, জামি'আ ফারুকিয়া করাচী
উস্তাযুল হাদীছ, জামি'আ ইসলামিয়া ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৩/৬, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো
এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।
(তাওবাহ ঃ ১১৯)

একজন আল্লাহওয়ালার বিস্ময়কর আত্মকাহিনী

আমার জন্ম ভারতের জৌধপুরের নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে। বাড়ীতে ঘানি দিয়ে তেল ভাঙ্গানোর কাজ হতো। যেহেতু আমরা চরম দারিদ্রতার শিকার ছিলাম, বিধায় যখন হতে আমি ঘানির বলদের পিছে হাটতে শিখলাম, তখন হতেই বাড়ীর কাজে লেগে গেলাম। যখন আরেকটু বড় হলাম, তখন থেকে গোবর কুড়ানোর কাজে লাগলাম। যেহেতু সে সময়ও খুবই ছোট ছিলাম, তাই দাদিজান আমার মাথায় টুকরী বসিয়ে দিতেন। আমি ঐ সকল গরুর যেগুলোকে চরানোর জন্য মাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পিছনে পিছনে চলে গোবর কুড়াতাম। যখন টুকরী ভরে যেতো, তখন বাড়ী ফিরে এসে দাদিজানের সাথে ঐ গোবর দিয়ে ঘুঁটে তৈরী করতাম।

শৈশবে দ্বীনী শিক্ষার জন্য আমাকে মক্তবে পাঠানো হয়েছিলো, সামান্য কিছু পড়েছিলাম। একদিন শিক্ষক আমাকে এমন মারাত্মভাবে প্রহার করলো যে, আমার পাজামা নষ্ট হয়ে গেলো। বাড়ী ফিরে এলাম, দাদিজান আমাকে গোসল করিয়ে সব পরিষ্কার করে দিলেন। ব্যস! প্রাতিষ্ঠানিক পড়া শোনার এখানেই সমাপ্তি ঘটলো।

আমার বয়স যখন এগারো বৎসর তখন আমার পিতার ইন্তিকাল হলো। তিনি মৃত্যুর সময় দু'টি পয়সাও রেখে যাননি, বরং কিছু ঋণ রেখে গেছেন। এ ঋণ আল্লাহ্‌পাক আমার দ্বারাই পরিশোধ করিয়েছেন।

যেহেতু ঘানির আয়ে সংসার চলতো না, খুবই কষ্ট হতো, তাই আমি যখন বাইরে গিয়ে মজদুরী করার মতো বড় হলাম, বাইরে গিয়ে গৃহ নির্মান কাজে মজদুরী করতে আরম্ভ করলাম। আমার এখনো মনে আছে যে, সে সময় আমাকে প্রতিদিন পাঁচ পয়সা মুজুরী দেওয়া হতো।

দ্বীনের প্রতি আকর্ষণের শুরু

জৌধপুর শহরে 'আহলে হাদীছ' সম্প্রদায়ের কিছু লোক ছিলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন খুবই সৎ ও নেককার ছিলেন। তাদের ওখানে মজদুরী করার সময় তাদের দ্বীনী আলোচনা শুনে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। আল্লাহ্‌পাকের রহমতে এই আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চললো। এই জৌধপুর শহরের কয়েকজন লোকের হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) এর সাথে সম্পর্ক ছিলো। থানাভনের কিছু লোকও এখানে সরকারী চাকুরীরত ছিলো। দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার পর তাদের সাথেও যোগাযোগ হলো।

এ সময় আমি আমার মজদুরীর উপার্জন হতে কিছু কিছু পয়সা বাঁচিয়ে ঐ সকল দ্বীনদার লোকদের পরামর্শ নিয়ে দ্বীনী বই-পত্র কিনে এনে অন্যকে দিয়ে পাঠ করিয়ে শোনতাম। এ সময় আমি নিজেও কিছু কিছু উর্দূ পাঠ পড়া শিখতে লাগলাম। উর্দূ নিজের ভাষা হওয়ার কারণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উর্দূ ভাষায় লিখা দ্বীনী কিতাবাদি পড়তে ও বুঝতে আরম্ভ করলাম।

আল্লাহ্‌পাক আমাকে সততা এবং মেধা উভয়টিই দান করেছিলেন, যার দরুণ মজদুরির ক্ষেত্রেও বরাবর আমি উন্নতি করতে থাকি। অবস্থা এমন হলো যে, বিল্ডিং নির্মাতাগণ নিজেরাই তাদের কাজের জন্য আমাকে খুঁজে ফিরতো। মজদুরীর সাথে সাথে কাজের দেখা-শোনা ও তদারকীর দায়িত্বও তারা আমার উপর ন্যস্ত করতো। এতে করে আমার আমদানীও বেড়ে গেলো। এছাড়া বাড়ীতে ঘানি দ্বারা তেল উৎপাদনের কাজও কিছুটা চলছিলো।

হযরত থানভী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাত ও বাইআত

হযরত থানভী (রহঃ) এর কিতাব পড়ে এবং থানাভনের লোকদের নিকট হতে হযরতের কথা শুনে শুনে হযরতে প্রতি একটি শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো। এ সময়ে শুনতে পেলাম যে, আমাদের জৌধপুর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত 'পীপাড়' নামক জায়গায় অমুক দিন হযরত থানভী (রহঃ) তাশরীফ আনবেন। সেখানে হযরত ওয়াজ করবেন। আমি হযরত থানভী (রহঃ) কে এক নজর দেখার ও তাঁর মূল্যবান ওয়াজ শোনার আশায় চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে 'পীপাড়' পৌঁছলাম। আমি সর্ব প্রথম সেখানেই হযরতের দর্শন লাভ করি। হযরতের ওয়াজও শোনলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আমার অন্তরে ওয়াজের অনেক 'আছর' হলো। একবার সুযোগ পেয়ে আমি হযরতের কাছে গিয়ে আরয করলাম, 'আমি জৌধপুরের অধিবাসী, মজদুরী করে খাই, হযরতের নিকট মুরীদ হতে চাই। হযরত আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন! এরপর বললেন, ঠিক আছে, অমুক সময় আমার কাছে এসো। আমি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলাম। হযরত আমার অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। অতপর 'বাই'আত' (মুরীদ) করে নিলেন। এর পর হতেই হযরতের সাথে আমার সম্পর্ক হয়ে গেলো।

মুনাজাতে মাকবুলের দু'আসমূহের প্রতি আমার সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিলো। মুনাজাতে মাকবূলের উর্দূ কাব্যানুবাদের অধিকাংশই আমার মুখস্ত ছিলো। ঘানির পিছে চলার সময় খুবই আগ্রহের সাথে এগুলো পাঠ করতাম। আমি মনে করি, আমি যা কিছু পেয়েছি, এ সকল দু'আর বরকতে পেয়েছি।

সংসার ছেড়ে ফকীর হওয়ার আগ্রহ

কিছু দিন পর আমার অন্তরে প্রবলভাবে এ আগ্রহ জাগ্রত হলো যে, সংসার ও সাংসারিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে 'ফকীর' হয়ে যাবো। যেহেতু স্ত্রী ছিলো, কয়েকটি সন্তানও হয়েছিলো, দাদীজান এবং আম্মাজানও জীবিত ছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে এই প্রশ্ন জাগ্রত হলো যে, (আমি সংসার ছেড়ে 'ফকীর' হয়ে বেরিয়ে গেলে) এদের কি

উপায় হবে ? একদিন এ প্রশ্নের উত্তর অন্তরে এই এলো যে, রুজীদাতা এবং প্রতিপালনকারীতো স্বয়ং আল্লাহ্, তুমিতো নও। আল্লাহ্পাকই এদেরকে প্রতিপালন করছেন। তিনিই এদের রুজীর কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া আজ যদি তোমার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তাহলে যে ব্যবস্থা হবে, তোমার অনুপস্থিতিতে সেই ব্যবস্থাই হবে। এ কথাটি মনপুত হলো এবং অন্তরে বসে গেলো। সুতরা সংসার এবং সবাইকে ত্যাগ করে 'থানাভন' চলে যাওয়ার নিয়ত করলাম।

একদিন শেষরাতে ঘানি চালাতে উঠে, সবাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে একটি লুঙ্গি ও কয়েকখানা কিতাব সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে চল্লিশ টাকা ছিলো। সেখান থেকে রাস্তা খরচের জন্য সাত/আট টাকা সাথে নিয়ে দিল্লীর পথে রওয়ানা হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার পরিচিত কেউ যদি আমাকে জৌধপুর হতে রেলগাড়ীতে উঠতে দেখে, তাহলে বাড়ীর লোকদেরকে জানিয়ে দিবে, আর তারা (আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য) পশ্চাদ্ধাবন করবে। এ কারণে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে 'পীপাড়' গিয়ে রেলগাড়ীতে উঠলাম। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, দিল্লী পর্যন্ত দীর্ঘ চব্বিশ ঘন্টার রেল সফরে শুধুমাত্র এক পয়সার 'মুলো' কিনে খেয়ে ছিলাম।

দিল্লী পৌছে পাহাড়গঞ্জে রাত কাটালাম। সকালে 'শাহেদারাহ' নামক স্থানে পৌছলাম, সেখান থেকেই থানাভনের রেলগাড়ী ছাড়ে। এখানে এসে জানতে পারলাম যে, থানাভনের ট্রেন রাতে ছাড়বে। দিন কাটানোর জন্য সেখানে এক মসজিদে আশ্রয় নিলাম। মসজিদে বসে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) রচীত কিতাব 'কুল্লিয়াতে এমদাদিয়াহ' (যা আমার সাথেই ছিলো) পড়তে আরম্ভ করলাম। ঐ কিতাবে একজন সংসারী ত্যাগী দরবেশের কাহিনী পাঠ করলাম।

এক সংসার ত্যাগী দরবেশের কাহিনী

আমারই মতো এক ব্যক্তির সংসার ত্যাগী হওয়ার সখ হলো। সে তার অসহায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে, সন্তান-সন্ততি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো এবং দরবেশী অবলম্বন করলো। স্ত্রী বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে বসলো। দীর্ঘদিন পর ঐ দরবেশ সাহেব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তার (তালাক দেয়া স্ত্রীর বর্তমান স্বামীর) বাড়ীর নিকট এসে পৌছল এবং নিজের প্রয়োজনে ঐ বাড়ীতে 'হাঁক' দিলো। গৃহকর্ত্রি (যে তার তালাক প্রাপ্তস্ত্রী ছিলো) দরবেশের হাঁক শুনে বের হয়ে তাকে দেখে চিনতে পারলো, (যে এই দরবেশই তার পূর্ব স্বামী) কিন্তু দরবেশ সাহেব তাকে চিনতে পারলেন না। গৃহকর্ত্রি দরবেশকে বললো, আপনি এখানে অবস্থান করুন, আরাম করুন। দরবেশ সাহেব রাজি হলো এবং সেখানেই কাঁধের ঝুলি নামিয়ে রেখে বসে পড়লো। গৃহকর্ত্রি দরবেশ সাহেবের অনুমতি নিয়ে, তার কাঁধের ঝুলি খুলে তাতে কি কি আছে দেখতে লাগলো। ঐ ঝুলিতে সাধারণ প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যাদি ছিলো। যেমন, সুই, সুতা, কেঁচী, লবন, মরিচ, আটা এবং কিছু পয়সা। ঐ মহিলা এক একটি করে জিনিষ ঝুলি হতে বের করে আর দরবেশ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে, এটি কি ? এবং কি কাজে লাগে ? দরবেশ সাহেব তার উত্তর দেয় যে, এটি এই জিনিষ এবং এই কাজে ব্যবহৃত হয়। শেষে ঐ মহিলা এক মুঠো ধুলো নিয়ে ঐ দরবেশ সাহেবের মুখে নিক্ষেপ করে বললো, দুনিয়া এবং সংসার বলতে শুধু আমিই ছিলাম, তোমার ঝুলির এ সকল জিনিষ যা তুমি সাথে নিয়ে ফিরো, এগুলো দুনিয়া নয়।

গৃহে প্রত্যাবর্তন

উপরোক্ত কাহিনী পাঠ করে আমার বোধোদয় হলো। অতঃপর এ কথাও চিন্তা করলাম যে, আগামীকাল যখন 'থানাভন' গিয়ে পৌছবো, তখন হযরত থানভী (রহঃ) সর্ব প্রথম প্রশ্ন করবেন, কেন আসছো ?

আর যদি বাড়ী থেকে কোন টেলিগ্রাফ এসে থাকে, তাহলে এ সম্ভাবনা খুবই প্রবল যে, খুব বকুনী খেতে হবে এবং কালই বাড়ী ফিরে যাওয়ার হুকুম হবে। ব্যস! এ কথা চিন্তা করে বাড়ী ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সেখান থেকে সরাসরি জৌধপুর চলে এলাম। বাড়ী ফিরে জানতে পারলাম, আমি যে তিন দিন যাবত অন্তর্ধান হয়েছি, সেই তিন দিন হতে আমার স্ত্রী কোন কিছু খায়নি, এবং কোন কিছু পানও করেনি শুধু কেঁদেছে এবং আল্লাহ্পাকের নিকট দু'আ করেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার চিন্তার পরিবর্তন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন এ সবই তার দু'আর ফল।

এর পর ইতমিনানের সাথে নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আল্লাহ পাক দ্বীনী উন্নতির সাথে সাথে দুনিয়াবী উন্নতি ও বরকতের দরজা খুলে দিলেন।

মেয়ের বিয়েতে কুসংস্কারের বিরোধিতা ও সমাজ থেকে বহিস্কার

আমার বড় মেয়ে যয়নাবের বিয়ে এক জায়গায় ঠিক হলো, আমি বিয়ের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একেবারে সাদাসিধেভাবে শরী'অত ও সুন্নাত অনুযায়ী বিয়ের কাজ সেরে মেয়ে উঠিয়ে দিবো। এ ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত রসম ও কু-প্রথার কোনই তোয়াক্কা করবো না। আমাদের গোত্রের ও সমাজের মুরুব্বী শ্রেণীর লোকদেরকে আমি প্রথমেই একথা জানিয়ে দিলাম, যাতে পরে কোন হাঙ্গামা ও মনক্ষুন্ন হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। মুরুব্বীগণ বললেন, বিয়ের সময় গান-বাজনা ও নাচের আয়োজন করার জন্যতো আমরা তোমাকে বাধ্য করবো না, তবে আমাদের গোত্র ও সমাজে প্রচলিত অমুক অমুক রসম ও রেওয়াজ তোমাকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। আমি তাদেরকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তারা কোনভাবেই বুঝ মানলো না। অতঃপর আমি বর পক্ষকে ডেকে বললাম, আমি সুন্নাত ও শরী'অত

বহির্ভূত কোন অনুষ্ঠান করবো না এবং আমার গোত্রের লোকেরাও এজন্য আমার বিরুদ্ধে, এখন আপনারা যদি মজবুত থাকেন এবং আমার সাথে একমত হন, তাহলে অমুক দিন মাগরিব নামাযের পর ছেলে নিয়ে আমার বাড়ীতে আসবেন, আমি বিয়ে দিয়ে দিবো। আর যদি আপনারা রসম রেওয়াজ ও কু-সংস্কার মুক্ত সাদাদিধে সুন্নাত ও শরী'অত মুতাবিক বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে সানন্দে আপনাদের ছেলের জন্য অন্য কোন মেয়ে নির্বাচন করতে পারেন, এতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। ছেলে পক্ষ আমার সাথে একমত হলো এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়পদ থাকার কথা প্রকাশ করলো। আমি বিয়ের দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে দিলাম। সাথে সাথে একথাও বললাম, আপনারা আপনাদের মহল্লার মসজিদে মাগরিব নামায আদায় করে আমাদের এখানে আসবেন। বিয়ে পড়ানো ও রুখসুতী (মেয়ে তুলে নেওয়া) শেষ করে নিজ মহল্লার মসজিদেই এশা নামায পড়বেন। সব কাজ সম্পন্ন করতে এতটুকু সময়ই লাগবে।

গোত্রপতি ও সমাজপতিগণ পঞ্চায়েতের মিটিং ডেকে আমার আপন ভাইয়ের মুখ দিয়ে আমাকে বয়কট করার ও সমাজ থেকে বহিস্কার করার ঘোষণা দিলো।

বিবাহের নির্ধারিত দিন সকালে আমি আমার আম্মাকে বললাম, আজ মাগরিব নামাযের পর যয়নাবের বিয়ে এবং রুখসুতী কাজেই কি কি লাগবে বলুন ? এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আম্মাজান আমার এ কথা শুনে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তাৎক্ষনিকভাবে কিছুটা দুঃখিতও হলেন। কিন্তু আমি যখন তাঁকে ভালভাবে বুঝালাম, তখন তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

কথা অনুযায়ী ছেলে পক্ষ মাগরিব নামাযের পর এলো, আমি বিয়ের কাজ সমাধা করে তখনই মেয়ে তুলে দিলাম।

হয়েছিলো যে, সে বার বার আগ্রহ প্রকাশ করতো যে, হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে মক্কা-মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। সুতরাং এ বৎসর যখন হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম, তখন সেও সাথে যাওয়ার জন্য খুবই জেদ করলো এবং করাচী পর্যন্ত সাথে গেলো। করাচী থেকে কোনভাবে তাকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠালাম।

মুহাররম মাসে আমার হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের কথা ছিলো। বিবি সাহেবা ছেলেদেরকে তাকিদ করে আমার আরামের নিয়তে বাড়ীর উপরের অংশে একটি রুম তৈরী করালো। তার পূর্ণভাবে চেষ্টা ছিলো আমি বাড়ী ফেরার পূর্বেই যেন ইহা সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যায়।

নয়ই মুহাররম সন্ধ্যায় বিল্ডিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলো, শ্রমিকরা চলে যাওয়ার পর বিবি সাহেবা স্বয়ং হাত লাগিয়ে তখনই উহা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলো, যাতে আজকের পবিত্র রজনীতে (আশূরার রাতে) ওখানেই ইবাদাত বন্দেগী করতে পারে। সুতরাং সে মাগরিব নামাযও ঐ নতুন ছাদের নীচে (যা মজদুরগণ আজই শেষ করেছে) জায়নামায বিছিয়ে আদায় করেছে। এশা নামাযও সেখানেই আদায় করে অভ্যাস মতো সেখানে বসেই তাছবীহ পড়ছিলো। তাছবীহ পড়া অবস্থায়ই জায়নামাযে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হাজার দানার তছবীহ হাতে ধরা ছিলো। রাতে প্রচন্ড ঝড় হলো। সেই ঝড়ে ছাদের একটি পাথর (যা সম্ভবত শ্রমিকরা ঠিক মতো লাগায়নি) খুলে পড়লো। পাথরটি একেবারে বিবি সাহেবার মাথায় পড়লো। সে সেখানেই জায়নামাযের উপর ইন্তিকাল করলো।

কয়েক দিন পর যখন বাড়ী ফিরে এসে ঐ মর্মন্তুদ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলাম, তখন হৃদয়-জগতে দুঃখ-বেদনার যে উত্তাল তরঙ্গ আছরে পড়লো তা বর্ণনাতীত। তবে একথা শুনে ও দেখে অত্যন্ত আনন্দ হলো যে, পরিবারের অন্যান্য সকলে এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার পরেও ধৈর্যের পাহাড় হয়ে আছে। সকলের অন্তর ক্রন্দন করেছে, চোখ অশ্রু প্রবাহিত করেছে, কিন্তু যবান লাগামহীন হয়নি।

আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দ্বিতীয় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মুখলেস বন্ধুগণ স্ত্রীহীন অবস্থায় দৃষ্টির হেফাজত করতে না পারার এবং নফসের ধোঁকায় পড়ার অনেক ভয় দেখালো এবং দ্বিতীয় বিয়ে করে নেওয়ার পরামর্শ দিলো। যদিও তাদের পরামর্শ ইখলাসপূর্ণ ছিলো (আল্লাহপাক এ ইখলাসপূর্ণ পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন) কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমতে আমার প্রবল ধারণা ছিলো যে, ইনশাআল্লাহ আমি এখন কোন ফিতনায় পড়বোনা, এজন্য আমি বন্ধুদের পরামর্শ সত্ত্বেও নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম না। আমার প্রভু আমাকে এমনভাবে (মহিলা সংক্রান্ত ফিতনা থেকে) হিফাজত করেছেন যে, আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে অন্তরে কোন ওয়াছওয়াছাও (সংশয়) পয়দা হয়নি। অন্য মহিলাতো দূরের কথা, বড় হওয়ার পর আমি আমার কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রীদের দিকেও ভালমতো তাকিয়ে দেখিনি।

আশরাফ মঞ্জিল

অন্তরে আকাংখা সৃষ্টি হলো, আল্লাহ্‌পাক যদি এমন ব্যবস্থা করে দেন যে, প্রত্যেক সন্তানের জন্য পৃথক পৃথক বাড়ী তৈরী করতে পারি। কিছুদিন পর জানতে পারলাম যে, এত দৈর্ঘ ও এত প্রস্তের একটি প্লট বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু ঐ প্লট ক্রয়ের মতো নগদ টাকা আমার নিকট ছিলো না। পরিবারের সকলে নিজ নিজ অলংকারাদি খুশি মনে বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। এভাবে আল্লাহ্‌পাক ঐ (বৃহত) প্লটের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু বাড়ী নির্মানের জন্য এখন কোন টাকাই ছিলো না। এ সময় আমার এক শুভাকাংখী জানালো যে, আমার নিকট এত টাকা আছে, আপনি এ টাকা দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিন এবং যখন আপনার জন্য সহজ হয়, তখন আমার টাকা ফেরত দিলে হবে। সুতরাং ঐ টাকা নিয়ে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে দিলাম। সাথে সাথে ঠিকাদারীর ভিত্তিতে অন্যদের নির্মাণ কাজও করতে থাকলাম। সে সময় আল্লাহ্‌পাক

এমন অস্বাভাবিক বরকত দান করলেন যে, নিজের আমদানী দ্বারা নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ঋণও পরিশোধ হয়ে গেলো।

আশরাফ মঞ্জিলের সকল বিল্ডিং লাল পাথরের তৈরী। (ঐ এলাকায় সাধারণতঃ বিল্ডিং ইটের পরিবর্তে পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়) দেখতে যদিও আড়ম্বরহীন কিন্তু খুবই মজবুত। আশরাফ মঞ্জিলে সতেরটি বাড়ী, (কোয়ার্টার) কয়েকটি দোকান, একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসা রয়েছে। আশরাফ মঞ্জিল যেন দুর্গের মতো একটি ছোট মহল্লা।

পুরো মসজিদ নির্মানে মাত্র পনেরশত টাকা খরচ হয়েছে। এ খরচও প্রস্তরময় ভূমির কারণে হয়েছে। কারণ শুধুমাত্র কূপ খনন করতেই চারশত টাকা খরচ হয়েছে। অর্থাৎ কূপ খননের ব্যয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এগারশত টাকায় মসজিদ নির্মাণ হয়েছে।

এক আজব স্বপ্নের বাস্তবরূপ

আশরাফ মঞ্জিল নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কিছু দিন পর অন্তরে এই আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, আমি এখন থেকেই এর মালিকানাস্বত্ব ঐ সন্তানদের নামে করে দিবো, যাদের উদ্দেশ্যে ইহা নির্মান করেছি। নিজেকে একেবারে নিঃস্ব বানিয়ে নিবো। এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আমি হযরত থানভী (রহঃ) এর খিদমতে চিঠি লিখলাম। হযরত থানভী (রহঃ) উত্তরে লিখলেন, যদি কোন শরয়ী মাসয়ালা জানতে চেয়ে চিঠি লিখা হয় এবং তা আমার জানা থাকে তাহলে তার উত্তরে দেওয়া জরুরী, সকল ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া জরুরী নয়। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এই যুগে সবকিছু অন্যকে দিয়ে নিজে শূণ্য হাত হয়ে যাওয়া কতটুকু সমিচীন ? হযরতের এ উত্তরে পেয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, এ ব্যাপারে হযরতের মত নেই। এজন্য আমি আমার ইচ্ছা সে সময় বাতিল করে দিলাম।

কিছুদিন পর ঐ আগ্রহ প্রবলভাবে পুনরায় জাগ্রত হলো, এখন আমি ভাবলাম, হযরত তো পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেননি। তাই এ ব্যাপারে

পরামর্শের জন্য আমার অন্য কোন মুরুব্বীর শরনাপন্ন হওয়াতে কোন দোষ নেই। কাজেই সেই মুরুব্বী যদি মালিকানা স্বত্ব সন্তানদের নিকট হস্তান্তর করার পরামর্শ দেন, তাহলে আমি তার উপর আমল করবো। এই চিন্তার পর আমি হযরত মাওলানা আশেক ইলাহী ছাহেব মিরাঠী (রহঃ) এর খিদমতে চিঠি লিখলাম। সে চিঠিতে আমার পরিকল্পনার কথা আরো বিস্তারিতভাবে লিখলাম। হযরত মিরাঠী ছাহেব (রহঃ) আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর দিলেন। এ উত্তরের পর আমি পুনরায় আমার পরিকল্পনা বাতিল করলাম।

এর কিছুকাল পর একদা হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) এর জীবনী পাঠ করছিলাম, হযরত আবু যর (রাযিঃ) এর জীবনী পাঠ করে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করে নিজে নিঃসম্বল হয়ে যাওয়ার আগ্রহ আরো প্রবলভাবে জাগ্রত হলো। তখন আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করলাম, আমি যে পরিকল্পনা নিয়েছি এটাতো কোন গোনাহের কাজ নয়। আমার মুরুব্বীগণ আমার প্রতি স্নেহ, কল্যাণকামীতা এবং আমার দুর্বলতার কারণে আমার পরিকল্পনার পক্ষে মত দিচ্ছেন না। আমি যদি আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে এ কাজ করি, তাহলে এটা আমার জন্য মঙ্গলজনকই হবে।

উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনার পর আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ছেলেদেরকে ডেকে তাদের সামনে আমার পরিকল্পনা পেশ করলাম। তাদের সকলেও একথা বললো যে, যতদিন আপনি জীবিত আছেন, সকল সম্পত্তি আপনার মালিকানায়ই থাকা উচিত। আমি তাদেরকে বললাম, আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কাজেই আমি এখন এ কাজ শেষ করতে চাই।

কিছু দিন পর মালিকানা হস্তান্তরের এই কাজ (দলীল-পত্রের মাধ্যমে) আইনগতভাবেও সম্পন্ন করলাম। আলহামদু লিল্লাহ্! এখন আমার মালিকানায় কোন কিছুই নেই।

আমি আমার প্রথম যুগে প্রায়ই স্বপ্নে নিজেকে বস্ত্রহীন (উলঙ্গ) দেখতাম। এতে আমার ব্রেনের উপর খুপ চাপ পড়তো। এজন্য এই স্বপ্নের কথা হযরত থানভী (রহঃ) এর নিকট লিখলাম, তিনি উত্তরে লিখলেন, স্বপ্নকে তেমন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর এটাও কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ্‌পাক জীবনের কোন এক সময় একাকিত্ব (তাজাররুদ) তথা দুনিয়ার সব কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার মতো সৌভাগ্য নসীব করবেন।

আমার সেই স্বপ্ন এভাবে (সকল সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সন্তানদের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে) বাস্তবায়িত হলো।

হযরত থানভী (রহঃ) এর ইজাযত (খেলাফত) লাভ

অকস্মাৎ (অকল্পনীয়ভাবে) হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) এর চিঠি আসলো। সে চিঠিতে হযরতের পক্ষ থেকে আমাকে تلقين بلابيعت এর (মুরিদ না করে মানুষকে দ্বীনের উপদেশ দেওয়ার) ইজাযত দানের কথা লিখা ছিলো।[১] আমার উপর এই চিঠির এমন 'আছর' হলো যে, (ভয়ে) অভ্যাসের বিপরীত মুখ থেকে চিৎকার বের হয়ে আসলো। অতঃপর আমি হযরত থানভী (রহঃ) এর খেদমতে চিঠি লিখলাম, আমি লেখা-পড়া জানিনা। আমি যিকির-শোগল (পীর সাহেবের বাতলানো অযীফা নিয়মিত আদায়

১. আত্মার রোগের চিকিৎসা (যা শরী'অতের দৃষ্টিতে ফরযে আইন) করানোর জন্য এবং আত্মার গুনাবলীর বিকাশ ঘটানোর জন্য (এটাও ফরয) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে বিশুদ্ধ পীর-মুরিদী সিলসিলা চলে আসছে। এই পীর-মুরীদির মধ্যে পীর সাহেবগন তাদের মুরিদদেরকে দুই প্রকারের খেলাফত দান করে থাকেন। (১) مجاز بيعت যাদের জন্য অন্য লোকদেরকে মুরীদ করার অনুমতি আছে। (২) مجاز صحبت এর অপর নাম تلقين بلا بيعت যাদের জন্য অন্যকে ধর্মোপদেশ দানের অনুমতিতো আছে কিন্তু অন্যকে মুরীদ করার অনুমতি নেই।

করা) কিছুই করিনি। তাছাড়া আমি একটি নীচু জাতের (কুলু সম্প্রদায়ের) লোক। অবশ্য বাহিক্যভাবে (নিয়মিত) আল্লাহপাক নামায-রোযা আদায়ের সৌভাগ্য নসীব করেছেন। রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব), আত্মগর্ব, অহংকার হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামোটি কিছুটা ধারণা আছে। আমার উপরোক্ত অবস্থায়ও যদি হযরত এটাকে (লোকদের ধর্মোপদেশ দান করা) সমিচীন মনে করেন, তাহলে আমি খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।

হযরত থানভী (রহঃ) তার নিয়ম অনুযায়ী আমার চিঠির (পাশের খালি জায়গার) উপর উত্তর লিখলেন, পড়া-লেখা না জানা এবং যিকির-শোগল না করা সম্পর্কে আমি যা লিখেছিলাম, হযরত থানভী (রহঃ) তার কোন উত্তর দেন নাই। আর আমি তেলী (কুলু) সম্প্রদায়ের লোক, আমার একথার উত্তরে হযরত লিখলেন, এতে অসুবিধা কি ? কোন কোন 'তেল'তো 'ঘী'র চেয়ে দামী। আর নামায-রোযা নিয়মিত আদায় করার সৌভাগ্য নসীব হওয়া সম্পর্কে আমি যে কথা লিখেছিলাম, হযরত থানভী (রহঃ) এর উত্তরে লিখলেন, এটা কি কোন সাধারণ নে'য়ামত ? রিয়া, আত্মগর্ব, অহংকার ইত্যাদি সম্পর্কে আমি যে লিখেছিলাম, এগুলো সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা আছে, এর উত্তরে হযরত লিখলেন, তাহলেতো نور على نور (সোনায় সোহাগা) আর সবশেষে যে আমি লিখেছিলাম আমার এ অবস্থা সত্ত্বেও যদি হযরত সমিচীন মনে করেন, তাহলে আমি খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি। এর উত্তরে হযরত লিখলেন, হ্যাঁ,অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ (এতে) বরকত হবে।

উপরে বর্ণিত বিস্ময়ক আত্মকাহিনী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর বিশিষ্ট مجاز صحبت (খলীফা) হযরত হাজী আব্দুল গফুর জৌধপুরী (রহঃ) এর এই রচনা আত্মকাহিনী রূপে তিনি নিজেই লিখেছেন। যা হযরত মাওলানা মঞ্জুর নোমানী ছাহেব (রহঃ) সম্পাদিত মাসিক আল ফুরকান জুন-জুলাই সংখ্যা ১৯৫০ ঈসায়ীতে "আল্লাহ্র এক ঝান্দা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনার শেষাংশে হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী (রহঃ) এর চমৎকার মূল্যায়ন এবং হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এর কিছু বিরল বৈশিষ্টের কথা সম্বলিত মূল্যবান একটি রচনা সংযোজিত হয়েছে। পাঠকদের খেদমতে সেটিকে অনুবাদ করে পেশ করা হলো।

হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী সাহেব লিখেছেন, এখন হাজী আব্দুল গফুর ছাহেব আশরাফ মঞ্জিলস্থ মসজিদের একটি ছোট প্রকোষ্টে থাকেন। এই কামরাটি সম্ভবতঃ এই নিয়তেই বানানো হয়েছিল। এখন হাজী সাহেব (এই হিসেবে যে, তার মালিকানায় কোন কিছুই নেই) 'ফকীর' এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দু'আ, (যা হাজী সাহেবের ও প্রিয় দু'আ ছিলো)

اَللّٰهم اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا - وَاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا - وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

(অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ্ ! আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় জীবিত রাখুন, এবং আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং নিঃস্ব (মিসকিনদের) দলে হাশরে উঠান) এর জীবন্ত নমুনা। কিন্তু হাজী সাহেবের সকল সন্তান-সন্ততি যেহেতু আল্লাহ্ পাকের রহমতে দ্বীনদার সৌভাগ্যশালী এবং অন্তর থেকে হাজী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলো, তাই হাজী সাহেবের মালিকানায় কোন কিছু না থাকা সত্ত্বেও তিনিই সবকিছুর অধিকারী। নেক কাজে এখনো তিনি পূর্বের মতোই প্রচুর খরচ করেন,

কিন্তু প্রতিটি পয়সা অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে উত্তম থেকে উত্তম জায়গায় খরচ করেন। নিজের জন্য খুবই কম খরচ করেন। হাজী সাহেব বলেন, আমার বয়স এখন ৮১ বৎসর। এখন আল্লাহর রহমতে তিন ছেলের দাওয়াখানা আছে। তারা (অসুখ-বিসুখে) বিভিন্ন প্রকার ঔষধ তৈরী করে নিজেরাই আমাকে দিয়ে থাকে। এছাড়া কখনো আমি আমার জন্য ঔষুধ ক্রয়ে এক টাকাও খরচ করিনি। আমার জানামতে আমি কখনো কোন ডাক্তারকে ফিস দেয়নি, অর্থাৎ এর প্রয়োজনই হয়নি। যেহেতু সব সময়ই কম খাওয়ার অভ্যাস করে নিয়েছি এজন্য আল্লাহপাকের দয়ায় অসুখই খুব কম হয়। আর যদি কোন সময় শরীর বেশী খারাপ হয়, তাহলে দু, তিন দিন গড়াগড়ি করে দাড়িয়ে যাই।

হাজী সাহেব পোষাকও এত সাদাসিধে ও সাধারণ পরিধান করেন যে, কাপড়ের এই দুর্মূল্যের যুগেও পূর্ণ এক সেট কাপড়ে (জামা, পাজামা ও টুপি) দু/তিন টাকার অতিরিক্ত খরচ হয় না। তদ্রূপ খানাও খুবই সাদাসিধে ও সাধারণ খেয়ে থাকেন। কষ্ট সহিষ্ণুতা ও মিতব্যয়িতাকে জীবনের সার্বক্ষনিক নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে অন্যকেও তাকীদ করতেন উপদেশ দিতেন যে, যতটুকু সম্ভব নিজেকে কষ্ট সহিষ্ণু এবং মিতব্যয়ী বানাও। নিজের জন্য ব্যয় সংকোচন করে পয়সা বাঁচিয়ে দ্বীনী প্রয়োজনে খরচ করো এবং আল্লাহ্পাকের অভাবী বান্দাদের প্রয়োজন মিটাও।

কয়েকটি ঈমানী বৈশিষ্ট

ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত

কোন মানুষের নিয়তের খবর এবং তার আভ্যন্তরীণ চরিত্রের সঠিক অবস্থাতো একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। তবে আচার-ব্যবহার ও আলামত দেখে মানুষও কিছুটা আঁচ করতে পারে। হযরত হাজী আব্দুল গফুর ছাহেবের সাথে আন্তরিক পরিচয়ের পর আমার আন্দাজ হলো যে,

সম্ভবঃত তার সকল কাজ এমন কি কারো সাথে তার আচার– ব্যবহার, খানা খাওয়ানো, পান করানো, লেন-দেন, কথা-বার্তা বলা পর্যন্ত সবই শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং ছওয়াব অর্জনের নিয়তে হয়ে থাকে। এটা কত বড় ঈর্ষনীয় নে'আমত।

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

(অর্থাৎ, এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।)

দু'আ ও শোকরের আধিক্য

হাদীছ শরীফ থেকে জানা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সময় সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতেন এবং এই স্মরণ অধিকাংশ সময় দু'আ এবং শোকর রূপে আদায় হতো। হযরত হাজী আব্দুল গফুর ছাহেবের মধ্যেও এই দুটি গুণ বিশেষভাবে প্রবল ছিলো। অধিকাংশ সময় তাঁর যবান দু'আ করা ও শোকর আদায়ে ব্যস্ত থাকতো। তিনি যা কিছু আল্লাহপাকের নিকট আরয করতেন, নিজের আরম্বড়হীন সাদাসিধে ভাষায় আরয করতেন। তিনি দু'আ এমনভাবে করতেন যে, মনে হতো দু'আর প্রতিটি শব্দ অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে। হাজী ছাহেবকে দেখে মনে হয় যে, আল্লাহর এই খাস বান্দা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সমাজে প্রচলিত কু-প্রথা ও রসম-রেওয়াজের তোয়াক্কা করেননি বরং প্রকৃত খাঁটি মাসয়ালার উপর আমল করেছেন।

বিনয় ও নিজকে মিটানোর মনোবৃত্তি

আমার দৃষ্টিতে হযরত হাজী ছাহেবের যে ঈমানী বৈশিষ্টটি সবচেয়ে সমুজ্জল ছিলো, তাহলো, তাঁর বিনয় ও নিজকে মিটানোর মনোবৃত্তি। যদি তিনি এমন কোন কাজে, যা সাধারণের দৃষ্টিতে অনেক হীন এবং নীচু বলে গণ্য হয়, অথবা যা করলে মানুষের নিকট ঐ ব্যক্তি সম্মানহীন হয়ে যায়। তিনি যদি সে কাজে আখিরাতে ছওয়াব অথবা দ্বীনের ফায়দার

কোন দিক দেখতে পান, তাহলে তিনি সে কাজ নির্দ্বিধায় বরং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি লোকে কি বলবে ? কি মনে করবে ? তার প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ করেন না।

একথা আমার পূর্ব হতেই জানা ছিলো হাজী সাহেব নেক কাজের যে বিভিন্ন ধারা কায়েম করে রেখেছেন, তার মধ্যে একটি ধারা এও ছিলো, তিনি দ্বীনী এবং ইসলাহী কিতাবাদি বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে আনিয়ে নিজের নিকট রাখতেন এবং পড়া-লেখা জানা লোকদেরকে পড়ার জন্য দিতেন। পরে যখন মনে হতো যে, এই ব্যক্তি এ কিতাব থেকে উপকৃত হবে, তখন ঐ কিতাব তাকে বিনামূল্যে হাদীয়া স্বরূপ দিয়ে দেন, অথবা তাকে ঐ কিতাব ক্রয়ের প্রতি উৎসাহিত করে লাইব্রেরী থেকে যে মূল্যে আনিয়েছিলেন, সেই মূল্যেই তার নিকট বিক্রি করে দিতেন। আবার কোন কোন সময় লাইব্রেরী থেকে ক্রয়মূল্যের চেয়েও অতিরিক্ত কমিশনে পাঠককে দিয়ে দিতেন। হাজী ছাহেবের খেদমতের এই ধারা প্রায় ৩০ / ৪০ বৎসর থেকে চলে আসছে। আমার নিকটতো এটাই অত্যন্ত বিনয়ের (লজ্জার) কথা বলে মনে হতো যে, কাউকে কিতাব ক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করে নিজেই তার নিকট কিতাব বিক্রি করা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অত্যন্ত বিস্ময়কর শিক্ষনীয় অভিজ্ঞতা হলো। হাজী আব্দুল গফুর সাহেব আমাকে জৌধপুর যাওয়ার জন্য চিঠি লিখলেন। আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং তাঁর পরামর্শে প্রোগ্রাম এভাবে বানানো হলো যে, প্রথমে আমি 'পীপাড়' যাবো, সেখানে দুদিন থেকে পরে 'জৌধপুর' যাবো। হাজী সাহেব চিঠিতে আমাকে এ কথা লিখলেন, আমি যেন তাঁর জন্য দেড়/দুশো টাকা মূল্যের সাধারণের বোধগম্য, দ্বীনী এবং ইসলাহী কিতাব 'আল ফোরকান লাইব্রেরী' থেকে সাথে নিয়ে যাই। আমি হাজী সাহেবের কথামতো কিতাব সাথে নিয়ে গেলাম। প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি 'পীপাড়' পৌঁছে দেখলাম হাজী সাহেবও সেখানে উপস্থিত আছেন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিতাব এনেছেন ? আমি বললাম জী হ্যাঁ ; এনেছি। তিনি বললেন, আমাকে কিতাব এখনই দিয়ে দিন। আমি বললাম, কিতাবতো জৌধপুরই নিয়ে যাবেন, যে ভাবে আমার বাক্সে আছে সেভাবেই থাক, জৌধপুর গিয়ে নিবেন। তিনি বললেন, না, আমাকে এখানেই দিয়ে দিন। আমি সকল কিতাব হাজী সাহেবকে বুঝিয়ে দিলাম। হাজী ছাহেব বললেন, যা কমিশন দেওয়া হবে, তা বাদ দিয়ে প্রতিটি কিতাবের মূল্য আমাকে বলে দিন। আমার একজন সফর সঙ্গী প্রতিটি কিতাবের কমিশন বাদ দিয়ে যে মূল্য হয়, তা লিখে দিলো। কিছুক্ষন পর আমি যখন নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলাম, দেখলাম মসজিদের পাশে একটি গাছের নীচে চাদরের উপর ঐ সকল কিতাব এভাবে সাজানো আছে, যেভাবে কোন কোন গরীব কিতাব বিক্রেতা মাটিতে চাদর বিছিয়ে কিতাবের দোকান লাগায়। আমি মনে করলাম হাজী সাহেব এই কিতাবের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়েছেন। সে এভাবে দোকান লাগিয়ে তা বিক্রি করছে।

পরদিন হাজী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরো কিতাব আছে কিনা ? আমি বললাম না, ওগুলোই ছিলো। তিনি বললেন ওগুলোতো এখানেই শেষ হয়ে গেলো। পরে আমি জানতে পারলাম যে ঐ দোকান হাজী সাহেব নিজেই লাগিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেই সেখানে বসে কিতাব বিক্রি করছিলেন। বিক্রির নিয়ম এই ছিলো যে, পড়া-লেখা জানা যাকেই তিনি দেখতেন, তাকেই ডেকে দু/একটি কিতাব হাতে তুলে দিতেন এবং বলতেন, এ কিতাব দেখো, যদি মনে চায় বাড়ীতে নিয়ে যাও, উপকারী মনে করলে এবং কেনার সামর্থ থাকলে কিনে নাও আর যদি কেনার সামর্থ না থাকে এবং তোমার পছন্দ হয় এমনিই (বিনা মূল্য) রেখে দিও, তবে আমাকে এসে জানিয়ে যাবে। পরে যখন আমি জানতে পারলাম স্বয়ং হাজী ছাহেব বসে ঐ পদ্ধতিতে কিতাব বিক্রি করেছেন, তখন একথা ভেবে আমার মনটা খারাপ হয় গেলো যে, আমার লিখিত

কিতাব বিক্রির জন্য হাজী ছাহেব এরূপ কষ্ট করলেন। সাথে সাথে এ আশংকা করেও মনটা বিষন্ন হলো যে, হয়তো অনেকেই মনে করবে যে, বিক্রির জন্য সফরের মধ্যেও আমি কিতাব সাথে নিয়ে ফিরি এবং এখানে আমি হাজী ছাহেবকে এ কাজে লাগিয়েছি।

আমার এখনতো স্মরণ নেই যে, এ সম্পর্কে হাজী ছাহেবকে আমি কিছু বলেছিলাম, নাকি হাজী ছাহেব নিজ হতেই আমাকে বললেন, হযরত আমারতো এতটুকু ইলম নেই যে, নিজে কিতাব লিখে আল্লাহর বন্দাদেরকে উপকৃত করবো। এবং এর ছওয়াব হাসিল করবো। তবে এতটুকুতো করতে পারবো যে, দ্বীনী কিতাব প্রচারের ক্ষেত্রে এবং অধিক থেকে অধিকতর আল্লাহর বান্দাদর নিকট ঐ কিতাব পৌছানোর জন্য নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। এভাবে এই ছাওয়াবে অংশীদার হবো, আমিতো এ লোভেই এরূপ করে থাকি।

একথাও লক্ষনীয় যে, এই 'পীপাড়' নামক জায়গা যেখানে হাজী ছাহেব এই দীনহীনভাবে কিতাব বিক্রির আমল করছিলেন, সেখানের অধিকাংশ লোকই হাজী ছাহেবকে একজন পীর ও মুর্শিদ এবং জৌধপুরের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হিসেবে জানতেন, চিনতেন। আসলে এমন নিজেকে মেটানোর মত আমল ঐ ব্যক্তিই করতে পারে, যার নফস একেবারে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং যার দৃষ্টি সবদিক থেকে সরে আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি ও আখিরাতের ছওয়াবের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে।

ধর্মের সঠিক বুঝ এবং ভারসাম্যতা

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, হাজী ছাহেব আলেম নন। দ্বীনের প্রতি আগ্রহ এবং দ্বীনী বুঝ হওয়ার পর কুরআন শরীফ শিখেছেন এবং উর্দু কিতাবাদি পড়তে ও বুঝতে শিখেছেন। যদিও চিঠি পত্র আদান-প্রদানের পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিলো, কিন্তু অধিকাংশ সময় চিঠি অন্যকে দিয়ে

লেখাতেন। নিজে সম্ভবতঃ দু লাইনও লিখতে পারতেন না। কিন্তু এ ধরনের লেখা-পড়া না জানা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌পাক দ্বীনের সঠিক বুঝের এমন দৌলত নসীব করেছেন যে, এতে আল্লাহ্ পাকের শানই প্রস্ফুঠিত হয়। একবার একটি ইলমী ও দ্বীনী বিষয়ে আমি এবং আমার সম্মানিত বন্ধু মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ছাহেব অনেক দিন পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। কিছুদিন পর আমার 'জৌধপুর' যেতে হলো, কথা প্রসঙ্গে হাজী ছাহেবের সাথে আমি ঐ বিষয়ের কিছু আলোচনা করলাম। হাজী ছাহেব নিজের সাদাসিধে শব্দে সাধারণ ভাষায় (ইলমী ভাষায় নয়) ঐ উত্তরই দিলেন, আমরা অনেক গভীর চিন্তা-ভাবনার পর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলাম।

এই সঠিক দ্বীনী বুঝের ফলেই তিনি স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) এর প্রতি সত্যিকার ইশ্‌ক এবং গভীর শ্রদ্ধাবোধ রাখা সত্ত্বেও সর্ব প্রকার বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত ছিলেন। যে ধরনের বাড়াবাড়ি অতিরিক্ত ভক্তি দেখাতে গিয়ে মুরীদগণ পীর ছাহেবের সাথে করে থাকেন। বরং এ ধরনের বাড়াবাড়ির সংশোধন করা হাজী ছাহেবের একটি অভ্যাস। হাজী ছাহেবের আলোচনার বড় অংশ হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) সম্পর্কে হলেও তা একেবারে সাদাসিধেভাবে হয়ে থাকে। তিনি হযরত থানভী (রহঃ) এর উল্লেখ 'মরহুম' অথবা 'হযরত মরহুম' শব্দ দ্বারা করতেন। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) এর উল্লেখ করলে তার মাগফিরাতের দু'আ করতেন।

হাজী ছাহেব নিজেই বলেছেন যে, একবার হযরত থানভী (রহঃ) এর একজন ভক্ত বার বার আমার মুখ থেকে হযরতের মাগফিরাতের দু'আ শুনে বললো, মাগফিরাতের ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে ? আমি বললাম, আরে ভাই, আল্লাহপাক সকল বাদশাহর বাদশাহ, সকল বিচারকের বিচারক, তিনি যার জন্য যা ইচ্ছে ফয়সালা করেন।

নবী-রাসূলগণ ও তাঁর বড়ত্বের সামনে কাঁপতে থাকেন, অন্যদেরকে দিয়ে মাগফিরাতের দু'আ করান। আমরা সবাই এবং আমাদের সকল মুরুব্বী মাগফিরাতের দু'আর মুখাপেক্ষী।

হাজী ছাহেব আরো শোনালেন, আরবের পবিত্র ভূমিতে আমাদের অমুক পীর ভাই, অত্যন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে আমার নিকট অভিযোগ করলো, অমুক বুযুর্গের মুরীদ ও ভক্তগণ তাদের পীর ছাহেবকে আমাদের হযরতের [হযরত থানভী (রহঃ)] এর চেয়ে বড় মনে করে। হাজী ছাহেব বলেন, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, তখনই এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলি, কিন্তু আমার মনে হলো, এখন আমি কিছু বললে, সে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, তাই সে সময় আমি তাকে কিছু বলিনি। পরবর্তিতে এক সময় আমি তাকে বললাম, আপনি অমুক সময় আমাকে একথা বলেছিলেন, আপনি চিন্তা করেছেন কি ? তারা তাদের পীর ছাহেবকে আমাদের হযরতের চেয়ে বড় মনে করাটা আপনার নিকট অপছন্দ হওয়ার এবং আপনার রাগের কারণ কি ? আমার ধারনায় এর একমাত্র কারণ হলো, এটা আপনার পছন্দের পরিপন্থি। আমার অবস্থাতো এই যে, আল্লাহপাক প্রতিটি কালিমা স্বীকারকারী মুসলমানকে ঈমান-আমল ও দ্বীনদারীর দিক দিয়ে আমাদের হযরতের চেয়ে অগ্রসর করে দিন এবং সবাইকে তাঁর চেয়ে উচ্চ স্তরের বরং হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর চেয়ে উচ্চ স্তরের অলী বানিয়ে দিন। এমন হলে আমার খুব আনন্দ হবে। অতঃপর হাজী ছাহেব বললেন, আমার এরূপ বলার দ্বারা হযরতের মর্যাদা হানী হয়নি বরং আল্লাহপাকের নিকট তাঁর যে মর্যাদা আছে তা ঠিকই আছে।

এ কথাও হাজী ছাহেব নিজেই শুনিয়েছেন যে, খেলাফত আন্দোলনের সময় যখন আমাদের আকাবিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো, তখন আমি হযরত মরহুমের [হযরত থানভী (রহঃ) এর] কুলবের দিকে মুতাওয়াজ্জোহ হয়ে (নিবিষ্ট হয়ে) এই দু'আ করতাম, আল্লাহপাক

যেন হযরতের কুলবের হিফাজত করেন। আর সে সময় আমার এ ব্যাপারটি এত প্রবল হয়েছিলো যে, আমার মনে হতো আমি যেন এ দু'আ বাধ্য হয়ে করছি। (স্বেচ্ছায় নয়)

একবার এক মজলিসে যখন হাজী ছাহেব একথা বয়ান করছিলেন, ঘটনাক্রমে তখন সে মজলিসে হযরত থানভী (রহঃ) এর একজন খলীফাও উপস্থিত ছিলেন। হাজী ছাহেব তাকে সম্বোধন করে বললেন, হযরত ৮আমার এরূপ দু'আ করাটা আদবের খেলাপতো নয় ? এ প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিলেন, ইনশা আল্লাহ্ ! না, এটা কখনো বেয়াদবী নয়। কারণ এ দু'আ সে সময় (আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে) আমার কুলবের উপর অবতারিত হতো।

সমাপ্ত